

মানবাধিকার বার্তা

thro.org.in

সেপ্টেম্বর, ২০২৬

পঞ্চম সংখ্যা



ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন

-:সম্পাদকীয়:-

দিমাগ নিয়ে যত জ্বালা

দিমাগ নিয়ে যত জ্বালা । স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী 'দিমাগী নকশালদের' বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন । তিনি বলেছেন সশস্ত্র নকশালদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। রয়ে গেছে দিমাগী নকশালরা। দিমাগী নকশালরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে সমাজকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যুবকদের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে উন্নত দেশ গড়ার প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে ।

পূর্বে নির্বাচনী প্রচারে ও পার্লামেন্টে ভাষনে প্রধানমন্ত্রী "শহুরে নকশালদের" বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে "নকশালী দিমাগ" বা "নকশাল সোচ" বলেননি। সেক্ষেত্রে পরিষ্কার হত তিনি মাওবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসীদের উল্লেখ করছেন। প্রধানমন্ত্রী সচেতনভাবেই "দিমাগী নকশাল" শব্দ বন্ধ ব্যবহার করেছেন। সত্যিই দিমাগ বড়ই বিপদজনক এবং ভয়ানক । হিন্দি বা উর্দুতে 'দিমাগ' বলতে বোঝায় মস্তিষ্ক, মাথা, মন , চেতনা, বুদ্ধি ইত্যাদি। 'দিমাগ' ব্যবহার করা অর্থ হল চিন্তা করা, ভাবা, যুক্তি খোঁজা, ভেড়ার পালের মত ছোট্ট নয়, চিন্তা ভাবনা করে, প্রশ্ন করে, বিচার বিবেচনা করে ছোট্ট বা কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া । প্রধানমন্ত্রী মোদী পূর্বেই বলেছেন উগ্রপন্থীদের "কাপড়াসে পহেচানো"। পোশাক দেখে কাউকে চিহ্নিত করা বা যাচাই করা। লুঙ্গি , মাথার টুপি বা হিজাব - পরিহিতদের উদ্দেশ্য করে বলা। অর্থাৎ এরা সবাই উগ্রপন্থী।

এখন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন "দিমাগী" মানেই বিপদজনক । যারা ভাবা প্র্যাকটিস করে, চিন্তা করে, বিচার করে, যুক্তি তর্কে বিশ্বাস করে, যাদের মাথায় গোবর নেই, আছে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, প্রশ্ন করার সাহস , যারা বিচার বিবেচনা শক্তির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয় , তারা সবাই বিপদজনক এবং ভয়ংকর অর্থাৎ তারা সবাই দেশদ্রোহী।

অন্ধভক্ত না হলেই দেশদ্রোহী। সমাজের পক্ষে ভয়ংকর। ফ্যাসিবাদী শাসন চায় অন্ধভক্ত , শুধুই অন্ধভক্ত। ভাবনাচিন্তা শক্তি রহিত একদল মানুষ । যাদের আচরণ ভেড়ার পালের মত।

হিটলার মুসোলিনী সহ সব ফ্যাসিবাদী শাসকদের বরাবরের ভয় মানুষের মস্তিষ্কে। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাকে । প্রশ্ন করার প্রবৃত্তিকে। বিচার বিবেচনা বোধ প্রয়োগ করার সহজাত মানবিক বৃত্তিকে।

লালকেল্লা ভাষণে প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি ভারতীয়ের মর্যাদা ও ব্যক্তিসত্তাকে আক্রমণ করেছেন , দিমাগী নকশাল বলতে প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগরিককে, ধীমান নাগরিককে, বুদ্ধি যুক্তি নির্ভর প্রত্যেক দেশবাসীকে। ঝোলা থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে।

সূচিপত্র

১. বালককেও এত ভয় - বিবেক রায় / 5
২. ডি. জি. অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যু : বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করল টি. এইচ. আর.ও - নিজস্ব প্রতিবেদন/ 7
৩. দুঃস্থ ও মেধাবি পড়ুয়াদের পাশে উমাপদ বর্মণ ও অঞ্জলি বর্মণ ট্রাস্ট- নিজস্ব প্রতিবেদন/ 9
৪. বেআইনি আটকের বিরুদ্ধে বিচারালয়ের ভূমিকায় উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া - নিজস্ব প্রতিবেদন/ 12
৫. দীর্ঘমেয়াদী দাবদাহ : শ্রমজীবী মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে - গৌতম রায় বর্মণ / 17
৬. জাতির সামনে পাহাড় প্রমাণ সমস্যা = কঠিনতম সংগ্রাম ছাত্র যুবদের সামনে বোধরায় দেববর্মা / 20
৭. অথ বন্দেমাতরম্ বিতর্ক - অলকানন্দা চৌধুরী / 29
৮. মঞ্চে প্রতিবাদের ভাষা: জেন জি আন্দোলনের নাট্যরূপ - প্রশান্ত চক্রবর্তী /32
৯. সুপ্রিম কোর্টের রায়ে 'শিল্প, সংজ্ঞার পরিবর্তনঃ বিপন্ন হবে শ্রমজীবীদের অধিকার ও মর্যাদা - পুরুষোত্তম রায় বর্মণ / 38
১০. কেমন হবে ওদের হিন্দুরাষ্ট্র? --- মিহিরলাল রায় / 44
১১. পলিফার্মাসি - ডা: রূপালী চৌধুরী / 49
১২. সামাজিক ও মানবিক অধিকার বিষয়ক কিছু কথা - রঞ্জনা দত্ত / 52
১৩. স্মার্ট সিটির স্মার্ট ধাক্কায় নাগরিক অধিকার ভুলুন্ঠিত: দায় কার? - মণিময় রায়/ 57
১৪. মানবাধিকার লুণ্ঠন করে চলছে বক্তৃতা - নিজস্ব প্রতিবেদন / 60
১৫. অর্থের অভাব দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের 'মিড ডে মিল' পাবার অধিকার রাখার চেষ্টা হচ্ছে: বেতনহীন কুকাম হেল্লাররা - নিজস্ব প্রতিবেদন/ 61
১৬. রাজ্যের পাম্প অপারেটররা সুখে নেই - রতন দেবনাথ/ 62

বালকেও এত ভয়

- বিবেক রায়



ছয় বছরের বালক। নাম তার আদিত্য কুমার। বাবা দিনমজুর, মা গৃহ সহায়িকা। বিহার পাটনা। বিহারের যুব-ছাত্ররা আন্দোলন করছে বিহার লোকসেবা আয়োগের নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে। আদিত্যের ঠিকানা বস্তি। রাষ্ট্রের চোখে বেআইনি বসতিতে।

আন্দোলনের ঢেউ ছোটদেরও স্পর্শ করে। শুধুমাত্র স্পর্শ করলে বললে ভুল বলা হবে। আন্দোলিত করে। আন্দোলন সংগ্রাম যখন তীব্র আকার নেয় তখন ছোটরা সামিল হয়ে পড়ে। ছোটরা কিন্তু ন্যায়-অন্যায়, ভালো মন্দ ইত্যাদি বুঝতে পারে।

একইভাবে আদিত্য সামিল হয়ে পড়েছিল ছাত্র যুবদের আন্দোলনে। অংশ নিয়েছিল স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ছাত্র যুবদের বিধানসভা অভিযানে। আদিত্য চোখ কান খোলা বালক। আদিত্য কথা বলতে জানে।

বিহার পুলিশ আদিত্যকে বিক্ষোভ স্থল থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। আদিত্যের মা-বাবাকে থানায় নিয়ে আটকে রাখে। কয়েক ঘণ্টা থানায় আটক রেখে আদিত্যের মা ও বাবার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। আদিত্যকেও মানসিক নির্যাতন করে বিহার পুলিশ।

৬ বছরের বালককে কি গ্রেফতার করা যায় ? থানায় আটক রাখা যায় বিনা গ্রেপ্তারে? ছয় বছরের বালক যদি কোন আন্দোলনে নিজ ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করে তবে কি সেখানে পুলিশ বা রাষ্ট্রের কোন আপত্তির সুযোগ আছে ? ছয় বছরের আদিত্যের বিরুদ্ধে কোন অপরাধমূলক কার্যকলাপের অভিযোগ নেই। তাহলে আদিত্যকে কেন থানায় নিয়ে যাওয়া হল। কেন মা-বাবা সহ আদিত্যকে থানায় আটকে রাখা হলো কয়েক ঘন্টা।

বিহার পুলিশ ক্রমবর্ধমান নাগরিক প্রতিবাদের মুখে পড়ে আত্মরক্ষায় বলছে, আদিত্যকে গ্রেফতার করা হয়নি। বালকের নিরাপত্তার জন্যই নাকি তাকে বিক্ষোভস্থল থেকে সরিয়ে থানায় এনে রাখা হয়। বাবা ও মাকে সতর্ক করা হয় ছেলে সম্পর্কে আরো বেশি যত্নবান হতে ভবিষ্যতে।

ছয় বছরের বালক সাবলীল ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেছে এটা সহ্য করা যায় না। বরদাস্ত করা যায় না। এত বড় সাহস, এত বড় বেয়াদবি। অসহ্য।

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015,

মোটাবেক শিশুদের অধিকার, মর্যাদা ও সুরক্ষা রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আইনের সাথে যদি কোন শিশু বিরোধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে তাকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

আদিত্য আইনের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েনি। আদিত্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। প্রতিবাদ সমাবেশে অংশগ্রহণ অপরাধ হতে পারে না। কোন শিশুকে তার তথাকথিত নিরাপত্তার জন্য থানায় নিয়ে এসে বসিয়ে রাখা বেআইনি। অপরাধ। থানায় কোন শিশুকে ডেকে এনে বসিয়ে রাখা মানসিক নির্যাতন। লাঞ্ছনা। বিহার পুলিশ সাফাই গাওয়ার জন্য যাই বলুক না তারা কিন্তু অপরাধী। বেআইনি আটকের দায়ে।

ছয় বছরের বালককে মানসিক নির্যাতনের দায়ে। বালকের সাংবিধানিক ও আইনি অধিকারের লংঘন করার দায়ে। বালকের বাক্য বানে নাজেহাল বিহার সরকার। বিহার পুলিশ। তাই বালককে থানায় নির্যাতন।

এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমাদের সামূহিক তিরস্কারে পাপীদের রজনীর পর রজনী বিনিদ্ধ কাটুক।

ডি. জি. অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যু : বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করল টি. এইচ. আর.ও

- নিজস্ব প্রতিবেদন

২০শে জুলাই, ২০২৬ । রাজ্যে পুলিশের সদর দপ্তরে পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যু হয় । মহানির্দেশকের অফিস কক্ষে মহানির্দেশকের মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অনুরাগ ধ্যানকর আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবী করা হয়েছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কার্যকারণ এবং কোন পরিস্থিতিতে পুলিশের মহা নির্দেশকের মৃত্যু হল পুলিশ সদর দপ্তরের স্বয়ং মহানির্দেশকের কক্ষে তা রাজ্যবাসীর জানা অত্যন্ত প্রয়োজন । পুলিশি হাজতে বিচারাধীন বন্দির হাজত হিংসায় মৃত্যু হলে আত্মা হত্যার গল্প বানানোতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছে পুলিশ প্রশাসন। নিহত অনুরাগ ধ্যানকর সৎ এবং দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসেবে ওয়াকিবহাল মহলে পরিচিত। রাজ্যে বিরাজমান কয়েক হাজার কোটি টাকার নেশা সামগ্রীর সংঘটিত অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে অনুরাগ ধ্যানকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাই সংঘটিত অপরাধ চক্রের পৃষ্ঠপোষকদের চাপে ছিলেন তিনি বলে অভিযোগ। যদি আত্মহত্যা হয় তাহলে কোন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের অসহনীয় চাপে ডি জি পর্যায়ের একজন পোড় খাওয়া দক্ষ ও সৎ অফিসারকে আত্মহত্যা করতে হয় তা উন্মোচিত হওয়া জরুরী । সরকার ও পুলিশ প্রশাসন ধামাচাপ দেওয়ার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। রাজ্যের আইনের শাসনের বারোটা বেজে গেছে তা অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুতে আবারো প্রমানিত হলো। পুলিশি তদন্তে মৃত্যুর আসল কারণ কখনোই সামনে আসবে না। পুলিশি তদন্ত লোক দেখানো ভড়ং ছাড়া অন্য কিছু নয়। পুলিশি তদন্ত চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী কি করে

বিধানসভায় বলেন ময়না তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী আত্মহত্যা করেছেন অনুরাগ ধ্যানকর।

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (টি. এইচ. আর.ও), ২০ শে জুলাই, ২০২৬ সনের অপরাহুই দাবী করেছিল, ডি জি পি অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর কার্যকারণ ও কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তা উদঘাটনের জন্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত। পরবর্তী ৬ সপ্তাহের ঘটনাক্রমে টি. এইচ. আর. ওর দাবী জোরদার ও যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। সরকার ও পুলিশ প্রশাসন সত্য গোপনে ব্যস্ত। তাই জরুরী বিচার বিভাগীয় তদন্ত। উচ্চ আদালতে কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে।

দুঃস্থ ও মেধাবী পড়ুয়াদের পাশে উমাপদ বর্মণ ও অঞ্জলি বর্মণ ট্রাস্ট

- নিজস্ব প্রতিবেদন



৯৩ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী। এসেছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সবাই পড়াশোনা করে এগোতে চায়। দাঁড়াতে চায় জীবনে। শিক্ষার জগতে সাফল্যের হাত ধরে ভবিষ্যৎ গড়তে চায়। বাঁধা আর্থিক দুরাবস্থা। পারিবারিক দারিদ্র। ১৬ই আগস্ট, ২০২৬, ৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেককে ৭ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করল উমাপদ বর্মণ অঞ্জলি বর্মণ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হল পুস্তক উপহার। পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড: বোধরায় দেববর্মা, বিজ্ঞান আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক অধ্যাপিকা আল্পনা সেনগুপ্ত ও ট্রাস্টের সহ-সভাপতি নিখিল দত্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে চেক ও পুস্তক তুলে দেন। দীপ্রদীপ্তি রায় বর্মণের বলিষ্ঠ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সূচনা হয় অনাড়ম্বর কিন্তু সত্যিই আন্তরিক অনুষ্ঠানের। ট্রাস্টের সম্পাদক সুব্রত দেববর্মা ৩রা নভেম্বর, ২০২৫, এ প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াতের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সামন্তা সাহা। স্বাগত ভাষণ দেন পুরুষোত্তম রায় বর্মণ। তিনি বলেন, ২০১৫ থেকে ট্রাস্টের পথচলা শুরু। ইতিমধ্যে ট্রাস্ট ৫০০ জন ছাত্রছাত্রীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে। এছাড়াও দুঃস্থ রোগীদের পাশে

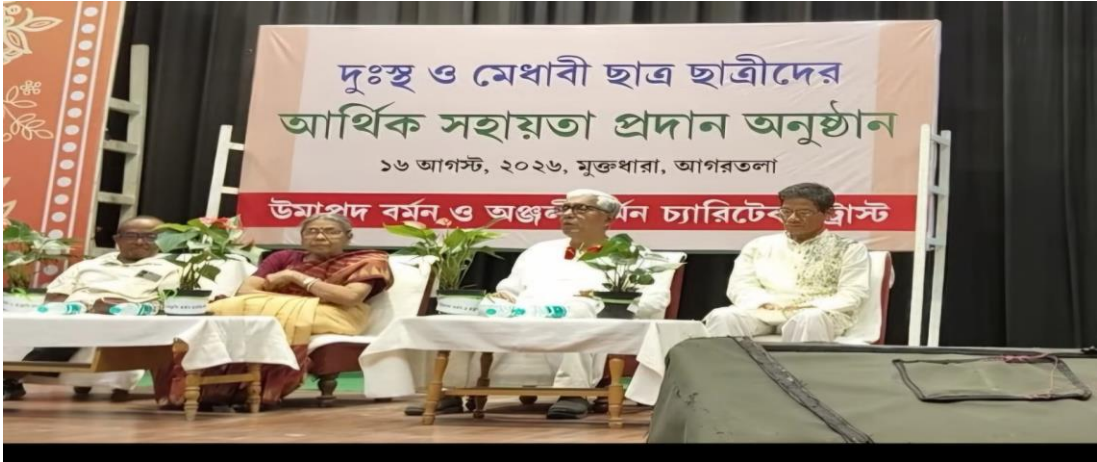
থাকার চেষ্টা করছে ট্রাস্ট বিভিন্ন ভাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দারিদ্রতার জন্য হীনমন্যতার কোন স্থান নেই, মাথা উঁচু করে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগোতে হবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রধান অতিথি মানিক সরকার উমাপদ বর্মণ ও অঞ্জলি বর্মণের স্বীচিচারণ করে বলেন, দুজনেরই স্নেহ পেয়েছেন। ছেলেমেয়েদের প্রকৃত মানুষ করার ক্ষেত্রে বাবা ও মায়ের ভূমিকার উপর জোর দেন। দেশের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র যুবদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। শিক্ষা ব্যবস্থার হাল নিয়ে ও সরকারি স্কুলগুলির করুণ অবস্থা নিয়ে খেদ প্রকাশ করেন পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী।

সাহিত্যিক বোধরায় দেববর্মা ছাত্র যুবদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার জন্য বর্তমান শাসকদের দায়ী করেন। তিনি ছাত্র যুবদের সৃজনশীল প্রতিবাদী ভূমিকার উপর গভীর আস্থা প্রকাশ করেন। অধ্যাপিকা আল্পনা সেনগুপ্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রাণবন্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে উদ্ভুদ্ধ করেন। উল্লেখ্য, ট্রাস্টের প্রয়াসে এবার যুক্ত হয়েছেন রনেন দাসগুপ্ত ও আলপনা সেনগুপ্ত। এই দম্পতি ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তার দায়িত্ব নিয়েছেন। একইভাবে ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ মিহির গুপ্ত ৫ জন ছাত্রছাত্রীকে আর্থিক সহায়তার দায়িত্ব পালন করেছেন। ট্রাস্টের পক্ষে গৌতম রায় বর্মণ জানিয়েছেন, আগামী দিনে ট্রাস্ট একই ভাবে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকবে। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান বিভিন্নভাবে ট্রাস্টের পাশে থাকার জন্য।



শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার। সবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তর অর্দি অবৈতনিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু এই রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালনে নিদারুণভাবে ব্যর্থ। শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রের ব্যয় রাষ্ট্রসংঘ নির্ধারিত হার থেকে দারুণভাবে কম। শিক্ষা এখন এদেশে কর্পোরেটদের মুনাফার মৃগয়া ক্ষেত্র। শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকরণ ও সাম্প্রদায়িকরণ ভয়াবহ আকার নিয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা বিশেষত উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের আওতার বাইরে চলে গেছে। বিগত এক দশকে সারা দেশে কমপক্ষে এক লক্ষ সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষার সুযোগ সংকোচন, শিক্ষাকে বাণিজ্যের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করা ও সমস্ত স্তরের শিক্ষায়তন গুলো দখল করে ছাত্রছাত্রীদের মগজ ধোলাই করে তাদেরকে চিন্তাশক্তি রহিত ভাবনা ও প্রশ্ন করার মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে অন্ধ ভক্তিতে গদগদ করার ফ্যাসিবাদী প্রকল্পের গালভরা নাম নয়া শিক্ষানীতি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ আক্রান্ত, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার বন্ধ করার জন্য যাবতীয় আয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গুলো দখল করতে মরিয়া ফ্যাসিবাদী শক্তি।



বেআইনি আটকের বিরুদ্ধে বিচারালয়ের ভূমিকায় উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া

-নিজস্ব প্রতিবেদন



প্রতিবাদের ও ভিন্ন মত প্রকাশের পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে দেশে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় একথা বলেছেন। বিচারপতি ভূঁইয়া সখেদে মন্তব্য করেছেন, ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কারণ তারা প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিবাদ করছে এবং আদালত ছাত্রদের জামিন দিচ্ছে না। যখন আদালত জামিন মঞ্জুর করছে তখন এমন সব শর্তে জামিন দিচ্ছে যার ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মারাত্মক ভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

বিচারপতি ভূঁইয়া সখেদে বলেছেন, "আমি দেশের কোন সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করব না। কিন্তু এটা বলা কোনভাবে অতিশয়োক্তি হবে না যে,

ভিন্ন মত প্রকাশের জনপরিসর দেশে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। নিজ মত প্রকাশ ও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করা একজন নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। বিতর্ক ও বিরুদ্ধ মত গণতন্ত্রের প্রাণ ভোমরা । দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাধারণ কার্যকলাপকে অপরাধের তকমা দেওয়া হচ্ছে । পরিবেশ বিপর্যয় সত্যিই এক ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে। নাগরিকরা পরিবেশ নিয়ে তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করলে তাদেরকে এমনভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয় যেন তারা দাগী অপরাধী। ক্যাম্পাসে ছাত্ররা প্রতিবাদ করলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়, ৩০-৪০ দিন পর তারা জামিন পায় না । তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়। তাদেরকে আদালত ছুটতে হয়, যা অবশ্যই সময় সাপেক্ষ।"

বিচারপতি ভূঁইয়া সঠিকভাবে বলেছেন, "একদল ছাত্রকে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় ইফতার পাটি করার জন্য গ্রেফতার করা হয়। আমি নিশ্চিত চিকেন বিরিয়ানি খাওয়া অপরাধ নয়। গঙ্গা নদীতে চিকেন বিরিয়ানি খাওয়া নিষিদ্ধ করে কোন আইন নেই । তারপরও ছাত্রদের গঙ্গা-বক্ষে চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ার তথাকথিত অপরাধে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদেরকে তিন মাস জেল খাটতে হয়। এর জন্য কি কাউকে গ্রেফতার করা যায় এবং তিন মাস জেলে আটক রাখা যায় ? আমার নিজের কাছেই এই প্রশ্ন। নাগরিকরা দেখছে, মানুষ সবকিছুর উপর নজর রাখছে"।

বিচারপতি ভূঁইয়া বলেন , একজন মন্ত্রী সেনাবাহিনীতে কর্মরত একজন মহিলা অফিসারকে সন্ত্রাসবাদীর কন্যা বলে অভিহিত করছেন। মন্ত্রীর এই ধরনের আপত্তিকর মন্তব্যের উপর সমাজ মাধ্যমে মতামত দেওয়ার জন্য এফআইআর করা হলো মতামত প্রদানকারীদের উপর। উপরোক্ত নাগরিককে আগাম জামিনের আবেদন করতে হলো আদালতে গ্রেপ্তারী জন্য এড়ানোর জন্য। আদালত জামিন দিল। কি শর্তে। পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। যদিও ব্যক্তি

ফ্লাইট রিস্ক নন এবং সমাজ মাধ্যমে কোন মন্তব্য করা যাবে না। জামিনের শর্ত বাক্ স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী।"

প্যালেস্তাইনীদেব প্রতি সংহতি জানিয়ে ও গাজায় জেনেসাইডের নিন্দায় প্রতিবাদ সমাবেশ করার পক্ষে বোম্বে হাইকোর্ট দাঁড়ায়নি। প্রতিবাদ সমাবেশ করার অনুমতি প্রদানের জন্য মুম্বাই পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য সিপিআই (এম) এর দায়ের করা আর্জি খারিজ করে বোম্বে হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি আর্জি খারিজ করার সময় মন্তব্য করেন, "আমাদের দেশের অনেক বিষয় রয়েছে। এই ধরনের প্রতিবাদ আমাদের দরকার নেই। এই কথা বলার জন্য আমি দুঃখিত আপনারা সবাই স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন - আপনারা গাজা ও প্যালেস্তাইনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কেন দেশের জন্য কিছু করছেন না। দেশপ্রেমিক নন। গাজা ও প্যালেস্তাইনের জন্য বলা দেশ প্রেম নয়। দেশের মধ্যকার বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলুন। যা বলেন তা করে দেখান।"

বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি মন্তব্য নিয়ে বিশ্বয় প্রকাশ করে বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া বলেছেন "আমার কাছে অদ্ভুত ও বিশ্বয়কর। বোম্বেব শিবাজী পার্কে একদল মানুষ গাজার অধিবাসীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় তারা বোম্বে হাইকোর্টের রিট মামলা করেন। প্রাঞ্জি বিচারপতি আবেদনকারীদের বলেন, আপনাদের কাছে দেশের কোন বিষয় নেই, আন্দোলন করার জন্য, কেন আপনাদের আপনাদের এতদূর যেতে হয় ? এ প্রসঙ্গে বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া বলেছেন, ভারত প্যালেস্তাইনকে স্বীকৃতি দিয়েছে ১৯৫০ এর দশকেই । ভারতে প্যালেস্তাইনের দূতাবাস রয়েছে। পরস্পরাগত ভাবে ভারত প্যালেস্তাইনীদেব পাশে থেকে থেকেছে। গাজায় গণহত্যা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দ্বারস্থ হয়ে জানায়, গাজায় যা হচ্ছে তা একটি জাতিগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আগ্রাসী অভিযান । একে জেনেসাইড বলে

ঘোষণা করা হোক। ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মুরলিধরকে রাষ্ট্রসংঘ নিযুক্ত করে গাজায় সংঘটিত হিংসা নিয়ে তদন্ত করতে। বিচারপতি মুরলিধর তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেছেন। রাষ্ট্রসংঘ তদন্ত রিপোর্ট গ্রহণ করেছে। গাজায় শিশু, মহিলা, প্রবীণদের উপর সংগঠিত ইজরাইলী হিংসার তথ্যভিত্তিক বয়ান এখন জনপরিসরে।"

মানবজাতি একটি অভিন্ন প্রজাতি। মানবজাতির ভবিষ্যৎ একই সুতোয় গাঁথা। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে যে কোন মানুষের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রকৃত অর্থে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন। সহমর্মিতায় আবদ্ধ আমরা। সমগ্র মানবজাতি। Herbert Spencer তাই সঠিকভাবে লিখেছিলেন,

"No one can be perfectly free till all are free:

No one can be perfectly moral till all are moral.

No one can be perfectly happy till all are happy."

যিনি গাজায় সংগঠিত ইতিহাসের ভয়ংকরতম গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাকে তো শয়তানও ঈর্ষা করবে। শয়তানও হার মানবে তার কাছে। দেশপ্রেমের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করতে চাইছেন নাকি। এই সংজ্ঞায় প্রতিবেশী জ্বলে পুড়ে মরে গেলেও তাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করা যাবে না, প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত শিশুর হাতে পানীয় ও খাবার দেওয়া যাবে না। দেশের মানুষ কেন বেকার, শিশুরা কেন স্কুলে না গিয়ে কারখানায় কাজ করে, এসব প্রশ্ন করা দেশদ্রোহিতা।

বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতির মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বিচারক পদে কি ধরনের বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি নিযুক্তি পেয়েছেন।

সামান্য মানবিকতা, সহমর্মিতা থাকলে পর কোন মানুষ এ ধরনের মন্তব্য করতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের প্রশ্নে কলেজিয়ামের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । কলেজিয়ামের নিয়োগ প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ। বিচারপতি ভূঁইয়া বলেছেন , কলেজিয়াম বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো কারণ দর্শায় না । কি কারণে সিনিয়রিটি লংঘন করা হলো, বাছাই প্রক্রিয়ায় কি ভাবে যোগ্যদের বাছাই করা হলো এ নিয়ে কলেজিয়াম জনসমক্ষে কোন কিছুই জানায় না। এই প্রেক্ষাপটে বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়া বলেছেন, জনগণের জানার অধিকার আছে কি ধরনের লোকেরা বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন ? কি প্রক্রিয়ায় তাদের বাছাই করা হচ্ছে। আমাদের বিচারকরা কি ধরনের রায় দিয়েছেন বা দিচ্ছেন।

দীর্ঘ মেয়াদী দাবদাহ : শ্রমজীবী মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে

- গৌতম রায় বর্মণ



বিগত ২-৩ বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা চড়চড় করে বাড়ছে। অনেক জায়গায় ৪৫° সেলসিয়াসের উপরে চলে যাচ্ছে। এল নিনোর প্রভাবে তাপমাত্রা আরো উপরে উঠার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সৌরতাপে নাস্তানাবুদ হচ্ছে মানুষ। দগদগে গরমের জেরে বিপর্যস্ত হচ্ছে ভৌত ও জৈব পরিবেশ। বিনষ্ট হচ্ছে জৈব বৈচিত্র্যের স্বাভাবিক ছন্দ। এর বিকল্প প্রভাব পড়ছে সামষ্টিক অর্থনীতিতে, উৎপাদনশীলতায় ও মানব মূলধন গঠনেও।

প্রচন্ড তাপে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা কমে। ফলশ্রুতিতে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন হ্রাস পায়। কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন মার খেলে ফুড ইনফ্রেশন মাথাচাড়া দেয়। দাবদাহের ক্ষতিকর প্রভাবে গরমের দেশগুলির গরীব হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দেয়। DELET AL - এর ২০০৯ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, গড়ে এক ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে মাথাপিছু জিডিপি ৪.৫ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Bilal ও Kanzig- এর সম্প্রতি কালের একটি গবেষণাপত্র Quarterly Journal of Economics -এ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার হিসাব অনুসারে গ্লোবাল টেম্পারেচার 1°C (এক ডিগ্রি

সেলসিয়াস) স্থায়ী বৃদ্ধির ফলে দীর্ঘকালে গ্লোবাল জিডিপি ২০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। Somanathanetal (2021)- এর ইদানিংকালের একটি গবেষণা রিপোর্ট Journal of Political Economy -তে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা রিপোর্টে হিসাব কষে দেখানো হয়েছে তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ভারতের মেনুফ্যাকচারিং আউটপুট বছরে প্রায় দুই শতাংশ হ্রাস পাবে। দেশের ৫০ হাজার মেনুফ্যাকচারিং ইউনিটের উপর ইদানিং কালের এক সার্ভে রিপোর্টে জানা গেছে, চড়া তাপের আঁচে শ্রমিকের কর্ম নৈপুণ্য হ্রাস পায়। কাজে অনুপস্থিতি বাড়ে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যে সকল কারখানাতে নেই সেখানে শ্রমিকদের চরম প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হয়। এর প্রভাবে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। পোশাক তৈরির কারখানা ও ইস্পাতের প্ল্যান্টের শ্রমিকদের কাঠফাটা গরমে সারাদিন কাজ করতে হয়। এই সকল শিল্পের শ্রমিকদের কাজের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, সপ্তাহের একটি বাড়তি মারাত্মক গরমের দিনের জেরে শ্রমিকদের প্রত্যাহিক কর্মদক্ষতা ৮% হ্রাস পায় পোশাক শিল্পে। সুরাটের বস্ত্র শিল্প কারখানাতেও তাপ প্রবাহের ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ছে উৎপাদনে। সমীক্ষায় দেখা গেছে দিনের তাপমাত্রার পারদ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উঠলে সুরাটের কারখানাগুলোতে উৎপাদন ২.৭ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়। গুজরাটের বিভিন্ন জেলার পোশাক শিল্পের কারখানার সমীক্ষাতেও দেখা গেছে প্রচন্ড গরমের জেরে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ৩.৫ শতাংশ পর্যন্ত নেমে যাচ্ছে। মেনুফ্যাকচারিং জিডিপির হিসাবে এই সর্বোচ্চ উৎপাদন হ্রাসের কথা বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (২০১৯) রিপোর্টে। এনিয়ে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করা হয়েছে। ভারতের তীব্র দাবদাহের কারণে শ্রমিকদের কাজের সময় কমছে। ২০৩০ সাল নাগাদ শ্রমিকদের কাজের সময় ৫.৮% নষ্ট হবে।

অত্যাধিক তাপমাত্রা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মক্ষমতা (Cognitive Performance) হ্রাস করে। অর্থাৎ শিশুর চিন্তা করা, লেখা, মনে রাখা ও

মনোযোগ দেওয়ার বিষয়গুলিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। সাধারণ ছোট কৃষক খেতমজুর ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা যে সকল ঘরে বসবাস করে সেগুলোতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা থাকে না। তাই কৃষিজীবী শ্রমিক পরিবারের পড়ুয়াদের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মক্ষমতা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি পিছিয়ে পড়ে। অর্থনীতিবিদ Garg, Maulik ও Taraz দেখেছেন যে, উচ্চ তাপমাত্রায় বিদ্যালয়ে পাঠরত বিদ্যার্থীদের অংক ও রিডিং পরীক্ষার নম্বর হ্রাস পায়। একই সাথে এই তিন অর্থনীতিবিদ বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, স্বাভাবিক তাপমাত্রার চাইতে পারদের পাঠ দীর্ঘদিন ধরে উপরে থাকলে কৃষিজীবী পরিবারের আয় কেবল হ্রাস পায় না, একই সাথে শিক্ষাঘাতে খরচও কাটছাঁট হয়। এর প্রভাবও কৃষিজীবী পরিবারগুলির পড়ুয়াদের উপর পড়ে। তারা পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ছুট হয়।

উপরের এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘকালীন দাবদাহ শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদনশীলতাকে দুইভাবে ক্ষুণ্ণ করে। এখনকার উৎপাদনশীলতা কমিয়েই ক্ষান্ত হয় না ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তির কর্ম দক্ষতার উপরও আঘাত হানে।

জাতির সামনে পাহাড় প্রমাণ সমস্যা : কঠিনতম সংগ্রাম ছাত্র যুবদের সামনে

- বোধরায় দেববর্মা

পৃথিবীতে কোন প্রান্তে, যেকোনো রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, বাঁচার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার, প্রগতিশীল আধুনিক যুক্তিবাদ দাবি করে। এ দাবীকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকেই। আজ থেকে প্রায় ৫৫০ বছর আগেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতীয় বৈষ্ণব কবি চন্ডীদাসের উচ্চারণ -

"চন্ডীদাস কহে শুন মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।।"

বাঁচতে গেলে দরকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। পৃথিবীর বিরাট সংখ্যক মানুষ এই মৌলিক প্রয়োজনীয় চাহিদা থেকে বঞ্চিত। এখনো বড় বড় শহরে আকাশচুম্বী বাড়ির পাশে পলিথিনের ছাপরা। সেটি বস্তি, দরিদ্র মানুষের বাস। তারা শহরের ডাস্টবিনের নোংরা ঐটো ঘেঁটে কুড়ে খায়।

কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই এর মতো মহানগরের রাস্তায় মাসের পর মাস জীবন কাটায়। তাদের উন্নয়নের কথা কেউ ভাবেনা। বাজেটে তাদের জন্য পয়সা ধরা হয় না। এদেরকে পথ সারমেয়র মত মনে করা হয়। পৃথিবীর বড় বড় মহানগরের এরূপ দৃশ্য বিরল নয়। তাদের খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, রোদ বৃষ্টির ঠান্ডায় থাকার মত বাসস্থান নেই। রোগ-শোকে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ক্ষুধা যন্ত্রণাই তাদের একমাত্র সঙ্গী। অথচ এরাও মানুষ। পাশে ওই ১২ তলা বাড়িতে মানুষ নামক যে বাস করে তারই প্রজাতি ওই শ্রেণীর মানুষগুলি যখন রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে ঐটো ঘেঁটে খাবার খুঁজে, পাশ দিয়ে হেটে যায় আরেক মানুষ, যাকে আমরা বলি শিক্ষিত ভদ্র মানুষ। এই দৃশ্য দেখে আমাদের মানবিক সত্তা শিউড়ে ওঠে না। মানবিক বোধ যেন তাদের জন্য নয়। একবিংশ শতাব্দীর

মানুষও সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কত বিকাশ , মানুষের জীবনযাত্রা আনন্দ বিলাসের কত আয়োজন অথচ ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের ফারাক যেন আরো চওড়া হচ্ছে। উপরে প্রদীপ্ত বিশাল বৈভব নিচে শুধুই ক্ষুধা যন্ত্রনা বাঁচার কাতর আর্তি। গ্রাম দেশের দরিদ্রের চিত্র আরো করুন। আদিবাসী দলিত নিম্ন বর্ণ মানুষের দরিদ্র আরো ভয়াবহ। এই বৈষম্য দূর করার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম দরকার। সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের ব্যাপক বিকাশ ঘটে চলছে । প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু মানুষ মানুষে অর্থের এই বৈষম্য দূর করার কি কোন সংজ্ঞা সূত্র এখন উদ্ভাবন হয়নি অর্থ বিজ্ঞানে? যতদিন মানুষের মধ্যকার এই ধনী দরিদ্র বৈষম্য দূর হবে না, মানুষের ভেতরের মানবিক বৈশিষ্ট্য গুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটবে না, মানুষকে পূর্ণ সভ্য বলা যাবে না । এর সমাধান মানুষকেই খুঁজতে হবে।

আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি । ৭৯ বছর পূর্ণ করে ৮০ বছরে পা দিয়েছি। চারদিকে শুধু অস্থিরতা, অবক্ষয় , স্থলন, কলঙ্ক আর দুর্নীতি সমাজকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে। যেন কিছুতেই তৃপ্ত হচ্ছে না। হেথা নয় অন্য কোথা । অন্য কোন খানে । আরো চাই ,আরো চাই , অনেক পেয়ে ও তৃপ্তি নেই। অর্থ ও ভোগ বিলাসের সীমাহীন নেশা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে ছাত্র যুব সমাজকেই । ছাত্র যুবক যাদের বয়স ১৬ অথবা ২৬ , আগামী ১০ বছরে তাদের বয়স ২৬ থেকে ৩৬। তারাই দেশের নাগরিক , দেশের ভবিষ্যৎ। কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে তারা নিজেরাই গড়ে নেবে সুন্দর ভারত, অন্যায় মুক্ত ভারত, দুর্নীতিমুক্ত ভারত, ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত ভারত। ছাত্র যুব সমাজের সামনে কঠিন সংগ্রাম। এক, কঠোর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞান সমৃদ্ধ করা । নিজের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক চেতনাকে মজবুত করা। দুই - ভারতের চলমান ধনী দরিদ্র অসাম্য , স্থলন দুর্নীতি গুলিকে নির্মূল করে সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলার কঠিনতম সংগ্রাম।

National Eligibility Cum Entrance Test 2016 (NEET) এ প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে সারা ভারতে প্রায় ২২ লক্ষ ৮ হাজার পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কোন গুরুত্ব দেয়নি। এত বড় দুর্নীতি। ভাব যেন এই সরকার দায়বদ্ধ নয়। সারা ভারতে প্রায় ৮২৩টি মেডিকেল কলেজ ও প্রতিবছর ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৩৯ জন স্নাতক ডাক্তার তৈরি হয়, প্রতি বছর এত বিশাল সংখ্যক ডাক্তার পৃথিবীর কোনও দেশে তৈরি হয় না। চীনে হয় কিনা জানিনা। গর্বে আনন্দে বুক ভরে যায় আমি এ দেশের নাগরিক। দেশের সেবা মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানেও দুর্নীতি এসে থাকা বসিয়েছে। কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমদিকে বোঝা যায়নি দেশের প্রত্যেক প্রান্তে ছাত্র যুবকদের মধ্যে এত ক্ষোভ এত ঘৃণা জমে রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই আন্দোলন তীব্রতর হল এই পুরো পদ্ধতির বিরুদ্ধে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে। ছাত্রদের দাবি মেনে শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কে পদত্যাগ করতে হলো। সরকার দায় এড়াতে পারল না। সব দাবী মেনে নিতে বাধ্য হলো। এই আন্দোলন পেশাদারী রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালিত আন্দোলন নয়। পরিস্থিতির প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হঠাৎ করে জেগে ওঠা আন্দোলন। দুর্নীতির উপরের অংশটা শুধু ছাঁটা হয়েছে। নিচের বহুদূরে প্রসারিত প্রথিত অংশ শিকড় এখনো সক্রিয় অক্ষত।

গোপনে প্রশ্ন চুরি করে খুব সতর্কতার সাথে তা চড়া দামে বিক্রি করার অপরাধমূলক বাণিজ্য দীর্ঘদিনের। দুর্নীতির এই গোপন সংগঠনের নেটওয়ার্ক বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে আছে। যখন প্রকাশ্যে আসে তখনই শুধু হৈচৈ। কোটি কোটি টাকার কারবার এই অপরাধ মূলক কর্মের। এসব অপরাধ মূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে রয়েছে ছাপাখানা, কম্পিউটার সেন্টার, পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তা। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে ইউ পি এস সি, স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষাগুলোও সন্দেহের বাইরে নয়, এছাড়া রয়েছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট

বোর্ড ও নবরত্ন, মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি সরকার অধিকৃত সংস্থা গুলিতে নিয়োগ। সবগুলিই সন্দেহের বাইরে নয়। এনআইটি, আইটি এবং অন্যান্য মেডিকেল কলেজ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ প্রায় সব সময় খবরের কাগজ গুলিতে ছাপা হয়। দুর্নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই দুর্নীতি গুলিকে রোধ করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ফাঁক ফোকর গুলি কোথায় চিহ্নিত করে, তা রোধের জন্য বাস্তবসম্মত, কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, উপর থেকে নিচ প্রতিটি স্তরে পদ্ধতির বিরাট পরিবর্তন আনতে হবে, এ না হলে সমাজ দেহের এই মারণ ব্যাধি কে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

দুর্নীতির ইজম পৃথিবীর অন্য সব ইজম এর চেয়ে শক্তিশালী। অতীত বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এবং এ দেশে সরকার পতনের মূল ভূমিকা পালন করেছে কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতি। Jhon Profumo দুর্নীতির জন্য গদি ছাড়তে হয়েছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী MacMillan কে, Watergate কেলেঙ্কারির জন্য গতিচ্যুত করা হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসনকে (Richard Nixon), লকহিড (Lockheed) কেলেঙ্কারি এর জন্য গদি ছাড়তে হয় জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাকুই জানাকা (Kakuei Janaka) কে।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের প্রথম দুর্নীতির মুখ হরিদাস মুন্ডা, এলআইসির এক কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকার লুট। সে সময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। মূল অভিযোগকারী ফিরোজ গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী। স্বয়ং জামাতা জহরলাল নেহেরুর। তারপর আরো অনেক বড় ছোট দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি যেমন ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ জিপ কেলেঙ্কারি, মারুতি কেলেঙ্কারি ১৯৭১, নাগরওয়ালা কেলেঙ্কারি ১৯৭১, বোফরস (কামান ক্রয়) কেলেঙ্কারি ১৯৮৬ সাল। ১৯৯২ সালের হর্ষ মেহতা স্ক্যাম। ১৯৯৬ সালের পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি ও লালু প্রসাদ, তহেলকা কেলেঙ্কারি ২০০১ এবং ২জি স্পেক্টাম কেলেঙ্কারি। সবগুলি হাইপ্রোফাইল কেলেঙ্কারি। ২০১১ থেকে ২০২৬, ১৫ বছর পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ

দুর্নীতি ভারতের ইতিহাসের এক ঘন কালো অধ্যায়। যুগে যুগে বড় বড় সারা জাগানো দুর্নীতি। জটিল সামাজিক ব্যাধি। ১৯৪৭ থেকে ২০২৬ দীর্ঘ ৮০ বছর একটার পর একটা বড় বড় দুর্নীতি হয়ে চলেছে। প্রথম প্রথম হইচই হয়, তদন্ত কমিটি গঠন হয়, লোক দেখানো তদন্ত হয়, প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করা হয় না। শাস্তি দেওয়া হয় না। কিছুদিন পর চাপা পড়ে যায়। অপরাধ, দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি বন্ধ হয় না। এখন আরো বেড়েছে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দুর্নীতি কেলেঙ্কারি ফাঁক ফোকর গুলি খুঁজে বের করতে হবে এবং তা বন্ধ করার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে হবে। অপরাধের সাথে কোন আপস নয়।

যে দলে কোন শৃঙ্খলা নেই, আদর্শ নেই, নীতি নেই, এইসব দল দেশ চালাচ্ছে। যাদের জীবনে কোন শৃঙ্খলা নেই, প্রশাসন চালানোর কোন অভিজ্ঞতা নেই তারাই দায়িত্বপূর্ণ আসনে বসে দেশ চালাচ্ছেন। এমনকি তাদের মধ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ব্যক্তি ও আছেন। তাদের মধ্যে সেবামূলক মনোভাব নেই, আছে কেবল লোভ, লালসা, ভোগ-বিলাসের সীমাহীন নেশা। বিভিন্ন দপ্তরে চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির ক্ষেত্রে ঘুষ খাওয়া, স্বজন পোষণ, উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বড় বড় সরকারি নির্মাণ কাজে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার মতো অপরাধ মূলক কাজে নেতা মন্ত্রী, কর্মী-কর্মচারীরা বিভিন্নভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত এই ব্যাধির বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন চালাতে হবেই। এ দায়িত্ব ছাত্র যুবকদের।

মানবদেহে বিভিন্ন রোগের মত সমাজের দেহও দুর্নীতি কলঙ্ক লেপটে থাকে। বিষয়টি এরূপ যেখানেই ন্যায় নীতি, সেখানেই অন্যায় দুর্নীতি। বাংলা থেকে শেখ হাসিনার পতন এবং পশ্চিমবঙ্গে মমতার পতনের মূল কারণ সীমাহীন দুর্নীতি, উদ্ধত্য ও জনরোষ। দুর্নীতি সমাজদেহে এক জটিল ব্যাধি।

সমাজতন্ত্রের মতো উন্নততর সমাজ ব্যবস্থাতেও কখনও কখনও কোথাও কোথাও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। অথচ যে ব্যবস্থায় মানুষের ন্যায় এবং নীতিবোধ অত্যন্ত দৃঢ় থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চিন ভ্রমনের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন-

"যেমন এই মুহূর্তে চিনের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে দুর্নীতি একটি গুরুতর সমস্যা-সংখ্যার বিচারে শুধু নয়, পার্টি নেতৃবৃন্দের একাংশ দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। চিন অবশ্য খোলাগুলি -তা স্বীকার করেছে এবং চেষ্টা করেছে দুর্নীতি বন্ধ করার।"

দেশ-(২ সেপ্টেম্বর ২০২২) সম্পাদকীয়-এর কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করতে চাই-

" দুর্নীতির উৎস সম্ভবত সৃষ্টির প্রথমলগ্ন থেকে। সত্যতার চাকা যত এগিয়েছে দুর্নীতি তার সর্বগ্রাসী ভঙ্গিতে গ্রাস করতে চেয়েছে সব দিকে। অতি প্রাচীনকাল থেকে ক্ষমতার বৃত্তে থাকা মানুষজনদের নীতিভ্রষ্ট হওয়ার ঘটনা সর্বজনবিদিত। রাজন্যবর্গ পাত্র-মিত্র- অমাত্যগণের একাংশের অসদুপায়ে, সামাজিকভাবে ধনাঢ্য অবস্থানে পৌঁছে যাওয়া নেহাত কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। প্রজাবর্গের দারিদ্র্য বিমোচন দূরের কথা, তাদের নিপীড়নের ফলে উদ্ভূত এক সমাজব্যবস্থায় এই শ্রেণির রাজকর্মচারীরা আচমকা অর্থবান এবং ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। আর এই পারিতোষিক বিনিময়ে অর্থবান শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার মধ্য দিয়ে তদন্তীণ আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় একধরনের গুণগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ন্যায়নীতি এবং ন্যায্যতাকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা, সেই সঙ্গে নিজের লোভ চরিতার্থ করার এমন ঘটনা সারা পৃথিবীতে ঘটেছে, কম-বেশি-স্থান ভেদে।"

বর্তমান ভারতবর্ষের ছাত্র-যুব সমাজ এবং সাধারণ দরিদ্র মানুষের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসাম্য, অন্ধবিশ্বাস, ও মৌলবাদ। এসবের বিরুদ্ধে সকল অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে নিরবচ্ছিন্নভাবে তীব্রতর আন্দোলন গড়ে তোলাই মূল কাজ। একাজ অত্যন্ত জটিল। কিন্তু করতেই হবে।

শেষ বলে কিছু নেই। শুরু বলেও কিছু নেই। কোনও কিছুরই শুরু এবং শেষ নেই। শেখার শেষ নেই, জ্ঞানের শেষ নেই। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। এই গতিবেগে আলো একবছরে যতদূরত্বে যায়, সেটি এক আলোকবর্ষ (one light year)। মহাকাশে নক্ষত্রগুলির দূরত্ব মাপার একক। এই গতিবেগে লক্ষ লক্ষ বছর দৌড়োলেও এই মহাব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমানার দেখা পাওয়া যাবে না। মহাব্রহ্মাণ্ডের এই বিশালতা মনুষ্য অনুভবের বাইরে। বড়োর ও শেষ নেই, ছোটরও শেষ নেই। পরমাণুর চেয়েও ছোটো ভেতরের প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রনগুলি। তাদের চেয়েও ছোটো হতে পারে। এগুলিকে তো মিলিমিটার দিয়ে মাপা যাবে না। এগুলি অদৃশ্য। এই দৃশ্য জগতের চেয়ে অদৃশ্য জগৎ আরও বিশাল। জানার শেষ নেই।

যতই জানব ততই এটিও জানব, আমি যা জেনেছি তার চেয়ে আমি এখনও যা জানিনি তা আরও আরও বেশি। তখনই আসে বিনয় ভাব। নত হওয়ার ভাব। জ্ঞানের কাছে নত হওয়া। যাদের জ্ঞান আহরণে নেশা, তারাই এই জীবন ও জগতকে অনুভব করতে পারেন।

এই মহাব্রহ্মাণ্ডে, এই পৃথিবীতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীব এবং জড় কেউ স্থির নেই। সবই গতিশীল, সবই প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ব্যক্তি আমার দেহেও প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। দশ বছর আগের ছবি দেখে নিজেই নিজেকে চিনতে পারি না। প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আসে, মনুষ্যের দ্বারা গঠিত সমাজ ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আসে। অতীতে যা ঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, আজ তা ঠিক নয়। ধ্রুব (constant) বলে কিছুই নেই। মানুষের চিন্তা-চেতনারুচিতে পরিবর্তন আসে প্রতি মুহূর্তে। পুরোনো ব্যবস্থা অচল, অকেজো হয়ে যায়, নতুন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে মানুষ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নতুনকে গ্রহণ করে মানুষ। যারা পুরোনো ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকে তারা পিছিয়ে পড়ে। আজ থেকে ২০০ বছর আগের অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন, কত পরিবর্তন। সতীদাহ, সহমরণ, বাল্যবিবাহ প্রথা, কুলীন ব্রাহ্মণের শতনারী-বিবাহ প্রথা। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, বর্ণবৈষম্য, ঘরে

তুকে না দেওয়া, জল স্পর্শ না করা, পর্দা প্রথা, ঘোমটা প্রথা, এক পাক্তিতে না বসা ইত্যাদি কতকিছু প্রচলিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিবাহ হয়েছিল ১৪ বছর বয়সে, স্ত্রীর বয়স ছিল ৮, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১১, স্ত্রীর বয়স ৫, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে হয়েছিল ২২ বছর বয়সে, স্ত্রীর বয়স ছিল ১১। এযুগে এসব দণ্ডনীয় অপরাধ। এযুগে যুবক-যুবতীরা বিয়ে করে ত্রিশ বছর বয়সের পর। যিশু খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করে ছিলেন ২০২৬ বছর আগে, বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করে ছিলেন ২৫২৬ বছর। আগে, হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১,৫০০ বছর আগে। মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল আনুমানিক ১৮০০ বছর আগে। জিশু খ্রিস্টের জন্ম ২০২৬ বছর আগে। সেই সময়ের, সেই দেশের এর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে খ্রিস্ট ধর্মের নিয়ম কানুনগুলি তৈরি হয়েছিল। হজরত মোহম্মদের জন্ম-আনুমানিক ১৫০০ বছর আগে। মুসলিম ধর্মের গ্রন্থ কোরান রচিত হয়েছিল সেই দেশের সেই সময়ের প্রেক্ষিতে। এই আড়াই, দুই হাজার বছরে পৃথিবীর মানব সমাজে বিরাট পরিবর্তন এসেছে দেশে দেশে, দিকে দিকে। যুক্তিবাদের বিকাশ ঘটেছে, বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। মানুষের চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। তাদের রচিত, বা নির্দেশিত ধর্মীয় বিধানগুলি এখন পুরোনো, সেকেলে এবং অকেজো। এসময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাহলে কেন সেগুলিকে অর্থহীনভাবে আগলে রাখা। ধর্মীয় গোঁড়া, মৌলবাদীরা আঁকড়ে রাখতে চায়। এসব পুরোনো, যুক্তিহীন ব্যবস্থাগুলি আঁকড়ে ধরে রাখা মানে মানুষের সভ্যতাকে পেছনে টেনে ধরে রাখা। বিশ্বাস, কুসংস্কার অগ্রগতির অন্তরায়। নারী উৎপাদনের যন্ত্র নয়। সর্বক্ষেত্রে নারী এখন পুরুষের সমঅধিকারী। মনুসংহিতায় নারীকে যেভাবে গণ্য করা হয় এ যুগে সে দৃষ্টিভঙ্গি চলেনা। ব্রাহ্মণের পা থেকে শূদ্রের জন্ম, ব্রাহ্মণের সেবা করাই শুধু শূদ্রের কাজ-এইসব বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি এ যুগে দণ্ডনীয় অপরাধ ও মানবতা বিরোধী। মনুর ভাষ্য এ যুগে মূল্যহীন। একইভাবে কোরানে হজরতের বাণী ও নির্দেশ নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে। শরিয়ত অর্থাৎ মুসলমানদের ধর্ম

সংক্রান্ত আইনেও নারীকে অনেকক্ষেত্রেই মূল্যহীন ঘরে রাখা হয়েছে। নারীরা হারেমে থাকবে, হিজাব, বোরখা পরিধান করে সারা শরীরও মুখ ঢেকে রাখবে। বাইরে বেরুবেনা না, পড়াশোনা করতে পারবে না। তিনবার তালাক বললেই বিবাহ বিচ্ছেদ। নারীর আর কোনও বক্তব্য থাকতে পারবে না। পুরুষ তিন, চারটি বিয়ে করতে পারবে। নারী পারবে না। শিক্ষার অধিকার কেবল পুরুষদের। পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার কেবল পুরুষের। নারীর অধিকার নেই। এযুগের মানুষের চোখে এ বিধানগুলি ছেলেমানুষির মতোই।

ভারত আধুনিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে সংবিধানের আইন-কানুন হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তির উপর ভিত্তি করে নির্মিত। কোনও ধর্মীয় আইন গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। হিন্দু বা মুসলিম যে কোনও ধর্মের নারীই হোক- নারীর আইন হবে একটিই। পুত্র সন্তান, কন্যা সন্তান দুজনেই পৈতৃক সম্পত্তির সমান অধিকারী হবে। লোকসভায়, রাজ্যসভায়, বিধানসভায় নারীর জন্য থাকবে পঞ্চাশ শতাংশ আসন। চাকরিতে, সামরিক বিভাগে, আধা-সামরিক বিভাগে পঞ্চাশ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদিতে পড়ার ক্ষেত্রেও ছাত্রীদের জন্য থাকবে পঞ্চাশ শতাংশ আসন সংরক্ষণ। তালাক, তিন তালাক আইন বিবাহ বিচ্ছেদের এই ব্যবস্থার কোনো স্থান নেই ভারতীয় সংবিধানে। বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে ক্ষতিগ্রস্তপক্ষ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকবে।

জাতির সামনে পাহাড় প্রমাণ সমস্যা। দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, দুর্নীতির আবর্জনা স্তূপ। এগুলি পরিষ্কার করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এক কঠিনতম সংগ্রাম ছাত্র-যুব সমাজের সামনে। কে দেবে নেতৃত্ব!

[এই নিবন্ধটি গত ১৬ আগস্ট ২০২৬ আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে - আয়োজিত এক আন্তরিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণ হিসেবে পঠিত। অনুষ্ঠানের আয়োজক উমাপদ বর্মণ ও অঞ্জলি বর্মণ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। নিবন্ধটি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে এখানে ছাপা হল -লেখক]

অথ বন্দেমাতরম্ বিতর্ক

- অলকানন্দা চৌধুরী

ভারতবর্ষ এ বছর আশিতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে মহা সমারোহে। অসংখ্য মানুষ এই স্বাধীনতার স্বপ্নকে সাকার করার জন্য জীবন দান করেছে অকাতরে। লেখক, শিল্পী কবিরা তাদের সৃষ্টি ক্ষমতার মাধ্যমে পরাধীন ভারতীয়দের মুক্তি মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সৃষ্ট 'বন্দেমাতরম্' কবিতা ও গানটি সারধ শত বৎসর ধরে আমাদের প্রিয়তম উচ্চারণ। শুধু পরাধীন ভারত বর্ষে নয় এই গানটিকে ঘিরে আমাদের হৃদয়ের আবেগ আজও বহমান। এই গানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে ভারতবাসী কখনোই কার্পণ্য করেনি। তবুও বর্তমানে এই গানটি ঘিরে যে নিদারুণ বিতর্ক, পারস্পারিক দোষারোপ, অকারণ প্রতিযোগিতা ও রাজনৈতিক খেয়োমেয়ি চলছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশভাগের মত অসহনীয় পরিস্থিতির শিকার হয়েও ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার বহন করার ইতিহাসকে নিতান্ত অবহেলা করারই অন্য নাম বন্দেমাতরম্ গান কে নিয়েই বর্তমান দিনের টানাপোড়েন।

'বন্দেমাতরম্' গানটি কে ঘিরে কিছুটা বিতর্ক স্বাধীনতার পূর্বেই শুরু হয়েছিল। যার কেন্দ্রে ছিল ধর্মীয় চিন্তা চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা। এই সংকট উত্তরণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় জহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত ও পরামর্শ দাবি করেন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে সকল ভারতীয়দের অংশগ্রহণ শুধু জরুরী নয় অবশ্য পালনীয় শর্ত। এই ধারণা থেকেই কবিগুরু মত প্রকাশ করেছিলেন, জাতীয় গান এমন হওয়া উচিত যা কোন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয়দের মনে কোন আঘাত সৃষ্টি করবে না। সেজন্যই তিনি বন্দেমাতরম্ গানের প্রথম দুইটি স্তবক গাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। দুটি সম্প্রদায় হিন্দু এবং মুসলমান

উভয়ের ভাবাবেগ কেই যথাযোগ্য মর্যাদা দান এভাবেই করা সম্ভব। কবিগুরু একটি চিঠিতে কবি বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন "বন্দেমাতরম্" ব্যাপারটা নিয়ে বাঙালি হিন্দু সমাজে যে উন্মত্ত বিক্ষোভের আলোড়ন উঠেছে আমার বুদ্ধিতে এ আমি কখনো কল্পনাও করিনি"। এই মন্তব্য দিয়েই বলা যায় বিষয়টি কবিগুরুকে কতটা আহত এবং বিচলিত করেছিল। জাগতিক ভাবে কবিগুরু আর নেই। থাকলে বর্তমানে বন্দেমাতরম কে ঘিরে যে ধুমুমার লড়াই শুরু হয়েছে সেটাও তার নিকট যথেষ্ট পীড়াদায়ক হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিনা দ্বিধায় মন্তব্য করেছেন, যারা, বন্দেমাতরম গানের কিছু অংশ বাদ দেবার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তারাই দেশভাগের বীজটি সর্বপ্রথম বপন করেছিলেন। অর্থাৎ কবিগুরু সহ তৎকালীন মহান নেতাদের সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই মূল্যায়ন করা হলো। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই গানটিকে জাতীয় গান করে তোলার ক্ষেত্রে কবিগুরুর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি যে গানটির সবটা নয় শুধু প্রথম দুটি স্তবক গাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন তার পিছনে ছিল যথার্থ গণতান্ত্রিক চেতনা। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের মত বহুসমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশে সংখ্যাগুরুদের মতোই সংখ্যালঘুরাও মত প্রকাশের ন্যায্য দাবিদার এবং সেই মত যুক্তিগ্রাহ্য হলে সেটা মান্যতা পাওয়াও জরুরী। এভাবেই বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব এবং সেই পদক্ষেপ গ্রহণই ন্যায্য সঙ্গত।

এই গান নিয়ে এত ডামাডোলের মধ্যে অনেকেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মতামত বিস্মৃত হয়ে গেছেন। অথচ এই মুহূর্তে অতি দেশপ্রেমিক! মানুষের সামনে সেইসব তুলে ধরা খুব জরুরী। বাঙালী হৃদয়ে জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তোলার প্রধান কারিগর বলে বঙ্কিমচন্দ্রকেই উল্লেখ করেছেন দেশবন্ধু, তাঁর মতে বঙ্কিম সৃষ্ট সাহিত্যই বাঙালির জাতীয় জীবন গড়ে ওঠার মূল ভিত্তি। এই মতের স্বপক্ষে বলেছেন ঋষি অরবিন্দও। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গড়ে ওঠার ফলশ্রুতিতেও বাঙালি জাতীয়তা বোধ উজ্জীবিত হয়েছিল। কিন্তু

সেখানে অন্য জাতি বা ভারতীয়ত্ব অস্বীকার করার কথা কিন্তু কখনোই বলা হয়নি। দেশবন্ধুর মতে বাঙালি কবি সেই কোন্ কালে লিখেছেন, " সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই" । এই পরক্তির মধ্যে বাঙালি চিন্তের বিশ্বজনিত উদারতার পরিচয় সুস্পষ্ট । তিনি এইভাবেই জাতি গৌরবকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কারণে কোন বিদ্বেষকে তিনি প্রশ্রয় দিতে চাননি। বন্দেমাতরম গানটিকেও তিনি বাঙালির নিজস্ব সম্পদ রূপে দেখেছেন এবং সেই সম্পদের উদার বিতরণের মধ্য দিয়ে যথার্থ ভারতীয়ত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেটিই হবে ভারতীয় মহাজাতি গড়ে তোলার যথার্থ প্রয়াস । এই ঐক্যবোধ ও অখন্ডতার বিশ্বাসকে আত্মস্থ করাই হলো আমাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব । কিন্তু সে বিষয়ে সচেতনতা নয় বরং উদাসীনতাই প্রকট। দুই রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং বিজেপি বন্দেমাতরম নিয়ে যে দ্বৈরথ শুরু করেছে তার ফলাফল বা পরিণাম নিয়ে তারা বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিনা দ্বিধায় মন্তব্য করেছেন , প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করার জন্যই উদ্যোগ নিয়েছেন । অতএব বন্দেমাতরম গান আর খন্ডাংশ গাওয়া চলবে না গাইতে হবে পুরোটাই । এই দুরূহ কাজটি সবার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয় জানা সত্ত্বেও শাসক দল এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতায় নেমেছে যার কারণে কোন ইতিবাচক ফলাফলের আশা করা দুরাশা। 'জনগণমন' জাতীয় সংগীতটি সম্পূর্ণ সুর ও উচ্চারণে গাওয়ার কাজটি খুব সহজ নয়। তাই মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে বন্দেমাতরম এর মত বৃহৎ এবং সংস্কৃত শব্দ বহুল গানটি সঠিক সুরে ও যথার্থ উচ্চারণে গাওয়া শুধু দুরূহ নয় কষ্টসাধ্য ও বটে। তাই সম্মান জানাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত গানটির চূড়ান্ত অসম্মানই নির্দিষ্ট হচ্ছে কিনা সেটা সত্যিই ভাবার বিষয়।

মঞ্চে প্রতিবাদের ভাষা: জেন জি আন্দোলনের নাট্যরূপ

- প্রশান্ত চক্রবর্তী



কিছুদিন আগে সাইমন রেনল্ডসের *Retromania: Pop Culture's Addiction to Its Own Past* (২০১১) গ্রন্থে আলোচিত 'রেট্রোম্যানিয়া' ধারণাটি পড়ছিলাম। সেই আলোচনার সঙ্গে বর্তমান 'জেন জি' আন্দোলনের কিছু লক্ষণীয় মিল খুঁজে পাই। একসময় চাকরি না পাওয়া, কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পারা কিংবা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে আমরা অনেকেই ব্যক্তিগত ভাগ্য বা অযোগ্যতা হিসেবে মেনে নিতাম। রাষ্ট্র, প্রশাসন কিংবা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকাঠামোকে প্রশ্ন করার সাহস খুব কম মানুষেরই ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের যুব আন্দোলন দেখিয়েছে যে, জনবিক্ষোভ শুধু রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্মই দেয় না; দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতাকেও নাড়া দিতে পারে, বিশেষ করে যখন সেই ক্ষমতা জনগণের সম্পদের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়।

ভারতেও সাম্প্রতিক সময়ে তরুণদের একটি স্বতঃস্ফূর্ত অরাজনৈতিক আন্দোলন 'ককরোচ জনতা পার্টি' ব্যানারে সংগঠিত হয়েছে। প্রচলিত ধারণা

অনুযায়ী, দেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বেকার যুবকদের উদ্দেশে 'তেলাপোকা' মন্তব্য করেছিলেন—যদিও পরে তিনি দাবি করেন, তাঁর বক্তব্য বিকৃতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। সেই বিতর্কিত মন্তব্যকেই ব্যঙ্গাত্মক প্রতীকে রূপান্তর করে জেন জি প্রজন্ম 'তেলাপোকা'কে দুর্নীতি ও প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এই সমকালীন আন্দোলনকে নাট্যরূপ দেওয়ার সাহসী উদ্যোগ নেয় 'জেন জি স্পেস থিয়েটার'। গত ২ আগস্ট ২০২৬, আগরতলার স্টুডেন্টস হেলথ হোম অডিটোরিয়ামে মঞ্চস্থ হয় তাদের প্রযোজনা *জেন/জি*। যতদূর জানা যায়, ত্রিপুরায়—এমনকি সম্ভবত দেশেও—চলমান একটি জন আন্দোলনকে প্রসেনিয়াম মঞ্চে উপস্থাপনের এটি প্রথম প্রচেষ্টা।

মাত্র বিশ মিনিটের এই প্রযোজনা ছিল দলের প্রথম মঞ্চায়ন। মঞ্চসজ্জা ছিল অত্যন্ত সংযত; বিশেষ আলোক পরিকল্পনা বা জটিল কারিগরি ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা নাটকের শক্তিকে খর্ব করতে পারেনি। বরং অভিনেতাদের প্রাণবন্ত অভিনয় ও আন্তরিক উপস্থাপনা দর্শকদের কাছে নাটকের বক্তব্যকে স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। অভিনয় ও বিষয়বস্তুর আন্তরিকতার ফলে দর্শকও সহজেই নাটকের আবেগ ও সামাজিক বার্তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছেন।

নাটকের শিল্পীরা সবাই ছিলেন জেন জি প্রজন্মের প্রতিনিধি। নাটকে দেখানো হয়েছে, এই প্রজন্ম প্রতিবাদের প্রধান মাধ্যম হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করলেও তাদের অবস্থান কেবল ভার্চুয়াল জগতে সীমাবদ্ধ নয়। শুরুতে পুরোনো প্রজন্মের অনেকেই—বিশেষ করে ক্ষমতাসমর্থক অংশ—ধরে নিয়েছিলেন যে এই আন্দোলন সামাজিক মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং বাস্তব রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিসরে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। কিন্তু সেই ধারণা দ্রুত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। নাটকে যেমনটি

দেখানো হয়েছে, দুর্নীতি, লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং জনজীবনের সঙ্গে জড়িত নানা সংকটকে সামনে রেখে আন্দোলনটি ক্রমেই বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

নাটকের অন্যতম শক্তি হলো, এটি কোনো বিমূর্ত প্রতিবাদের গল্প বলে না; বরং একটি প্রজন্মের সুনির্দিষ্ট দাবি ও উদ্বেগকে মঞ্চে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। নাটকে প্রথম দাবি ছিল, ভারতের কোনো অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পুনরায় কোনো উচ্চ সরকারি পদে নিয়োগ দেওয়া যাবে না কিংবা রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না। দ্বিতীয় দাবি, সংসদে আসনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মহিলা আসন সংরক্ষণ বিষয়টি যুক্ত না করে জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয় দাবি ছিল, বড় শিল্পগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন সেই সব সংবাদমাধ্যমের লাইসেন্স বাতিল করা, যেগুলো আন্দোলনকারীদের মতে সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপকে অন্ধভাবে সমর্থন করে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের কোনো কর্মকর্তা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃত নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনের অধীনে বিচার হওয়া উচিত—এমন দাবিও নাটকে উচ্চারিত হয়েছে। আন্দোলনকারীদের যুক্তি, একজন প্রকৃত নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা গণতন্ত্রের ওপর গুরুতর আঘাত।

নাটকের চিত্রনাট্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিপ্লবী গানকে অত্যন্ত সচেতনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গানগুলো শুধু আবহ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং নাটকের ভাবনা ও বক্তব্যকে আরও গভীর করেছে। অভিনেত্রীদের নৃত্য ও সমবেত পরিবেশনার সঙ্গে গানগুলোর সংযোজন 'জেন জি' প্রজন্মের ক্ষোভ, প্রতিবাদ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে শক্তিশালী নাট্যভাষায় রূপ দিয়েছে।

নাটকের গঠনেও একটি স্পষ্ট নাটকীয় দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। একদিকে একদল শিল্পী 'জেন জি' প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে পরিবর্তনের দাবি তুলে ধরেছে, অন্যদিকে দুজন শিল্পী প্রবীণ প্রজন্মের প্রতিনিধি হয়ে সেই দাবিগুলোর বিরোধিতা করেছেন। শুরুতে তারা আন্দোলনকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেন এবং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে বিদ্রূপ করেন। কিন্তু আন্দোলন যখন ধীরে ধীরে জনসমর্থন অর্জন করে এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন তারাই কঠোর দমননীতির পক্ষে সওয়াল করতে শুরু করেন। নাটকে তাদের বক্তব্যে উঠে আসে আন্দোলনের নেতাদের কারারুদ্ধ করার আহ্বান, আন্দোলনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা এবং প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলার প্রবণতা। কিন্তু এই প্রতিকূলতার মধ্যেও 'জেন জি' পিছু হটে না। বরং আন্দোলন আরও বিস্তৃত হয়, নতুন মানুষ যুক্ত হয় এবং প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ক্রমশ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পোশাক পরিকল্পনাও নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। 'জেন জি' প্রজন্মের চরিত্রে অভিনয়কারী শিল্পীরা কালো পোশাকের সঙ্গে গলায় লাল কাপড় ধারণ করেছেন। এই কালো পোশাক কেবল একটি নান্দনিক নির্বাচন নয়; এটি দুর্নীতি, বৈষম্য ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। একই সঙ্গে এটি একটি প্রজন্মের সম্মিলিত সংহতি, নৈতিক অবস্থান এবং পরিবর্তনের দাবিকেও চিহ্নিত করে। অলঙ্করণহীন এই পোশাক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিল্পীদের বক্তব্যের দিকে, বাহ্যিক চাকচিক্যের দিকে নয়।

অন্যদিকে লাল রঙ নাটকে বিপ্লব, আত্মত্যাগ এবং আপসহীন প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। গলায় জড়ানো লাল কাপড় যেন একটি দৃশ্যমান ঘোষণা—এই প্রজন্ম নীরব থাকবে না। একই সঙ্গে এই রঙ বাংলা সাহিত্য, গণসংগীত এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দীর্ঘ প্রতিবাদী ঐতিহ্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

নাট্য-পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, প্রবীণ প্রজন্মের চরিত্রে অভিনয়কারী দুজন শিল্পীর গলায় লাল কাপড় রাখা হয়নি। এই সামান্য কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্য-নির্মাণ তাদের অবস্থানকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। তারা নাটকে 'জেন জি' আন্দোলনের প্রতিটি দাবি প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং প্রতিষ্ঠিত মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করেন। ফলে মঞ্চে দৃশ্যগতভাবেও দুটি বিপরীত মতাদর্শের সংঘাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এটি দলটির প্রথম মঞ্চ-প্রযোজনা—এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখলে অভিনয় ছিল বিস্ময়করভাবে স্বতঃস্ফূর্ত। কোথাও অপ্রয়োজনীয় নাটকীয়তা বা কৃত্রিম আবেগের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। প্রত্যেক শিল্পী তার চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের অভিনয়ের আন্তরিকতা এমন ছিল যে, অনেক সময় দর্শক ভুলেই গিয়েছেন তারা একটি নাটক দেখছেন; বরং মনে হয়েছে, যেন একটি জীবন্ত আন্দোলনের ভেতরেই উপস্থিত রয়েছেন।

'জেন জি স্পেস থিয়েটার'-এর এই প্রযোজনার রচয়িতা বিভূ ভট্টাচার্য এবং নির্দেশক সাগরিমা দে । আবহসংগীত নির্মাণ করেছেন প্রবাল মজুমদার ও প্রভাত রুদ্র পাল। অভিনয়ে ছিলেন ময়ূখ চক্রবর্তী, সাগরিকা চক্রবর্তী, সৌরমিতা সেন, রাহুল রায়, সোমায়নিকা বণিক এবং সাগরিকা দে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চরিত্রে শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত অভিনয় উপহার দিয়েছেন এবং সম্মিলিতভাবে নাটকটির বক্তব্যকে দর্শকের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

নাটক শুরুর আগে সলিল চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের বিপ্লব-চেতনা জাগানো গান গেয়ে দর্শকদের মানসিকভাবে নাটকের আবহে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তিনজন নৃত্যশিল্পীর পরিবেশনা অনুষ্ঠানের সূচনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য সংক্ষেপে 'জেন জি' আন্দোলনের পটভূমি ও উদ্দেশ্য

ব্যাখ্যা করেন, যা দর্শকদের নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে সহায়তা করে।

এই প্রযোজনার সবচেয়ে বড় সাফল্য সম্ভবত এখানেই যে, এটি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারপত্র হয়ে ওঠেনি; বরং একটি সমসাময়িক প্রজন্মের প্রশ্ন, ক্ষোভ, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিবাদের ভাষাকে মঞ্চে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। দর্শক নাটকের প্রতিটি দাবি সমর্থন করবেন কি না, সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তাঁদের নিজস্ব। কিন্তু একটি বিষয় অনস্বীকার্য—এই প্রযোজনা সমকালীন সমাজবাস্তবতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। আর সেই কারণেই ‘জেন জি’ কেবল একটি নাটক নয়; এটি আমাদের সময়, আমাদের তরুণ সমাজ এবং তাদের উচ্চারিত প্রশ্নগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্য-দলিল।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে 'শিল্প, সংজ্ঞার পরিবর্তনঃ বিপন্ন হবে শ্রমজীবীদের অধিকার ও মর্যাদা

- পুরুষোত্তম রায় বর্মণ

সুপ্রিম কোর্টের ৯ সদস্যক সাংবিধানিক বেঞ্চ ৫ -৪ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় ১৯৭৮ সনে প্রদত্ত সুপ্রিম কোর্টের ৭ সদস্যক সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়কে উল্টে দিয়েছে। ২০শে আগস্ট, ২০২৬ সনে সুপ্রিম কোর্টের ৯ সদস্যক সাংবিধানিক বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে বলেছে, ৪৮ বছর পূর্বে সুপ্রিমকোর্টের ৯ সদস্যক বেঞ্চ 'শিল্পের' সংজ্ঞা নির্দেশ করে যে রায় দিয়েছে তা সঠিক নয়। এর ফলে শ্রমজীবীদের একটা বিরাট অংশ 'শিল্প' বা 'Industry' আওতার বাইরে চলে যাবেন। এর ফলে শ্রম আইনের সুরক্ষা পাবেন না। বিগত ৪৮ বছর ধরে ব্যাঙ্গালোর ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড সুয়ারেজ বোর্ড বনাম এ রাজাপ্পা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ২(জ) ধারা অনুযায় ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্প বলতে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে ধরা হবে এবং কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান শিল্প বিরোধ আইন অনুযায়ী 'শিল্প' হিসেবে গণ্য হবে কিসের ভিত্তিতে সে সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত রায় প্রদান করেছিল। ৭ সদস্যক সাংবিধানিক বেঞ্চের পক্ষে মূল রায়টি লিখেছিলেন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার। সুপ্রিম কোর্ট "ট্রিপল টেস্ট" "তিন পরীক্ষার" মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান শিল্প কিনা তা নির্ণয়ের জন্য রায় দিয়েছিল।

মালিক ও কর্মচারীদের সহযোগিতার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক তৎপরতার দ্বারা যদি কোন প্রতিষ্ঠানে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন বা বিতরণ করা হয় তবে সেই প্রতিষ্ঠান 'শিল্প' বা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গণ্য হবে। এই রায়ের ফলে হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকারি দপ্তরগুলো ও শিল্প বিরোধ আইনের অধীনে 'শিল্প'

বা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গণ্য হতো। সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭৮ সনের রায়ে বলেছিল, লাভ বা প্রফিট মূল উদ্দেশ্য না হলেও কোন প্রতিষ্ঠান শিল্প হিসেবে গণ্য হতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট 'Dominant Nature' বা 'মূল চরিত্র' পরীক্ষা প্রয়োগ করে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা শিল্প কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য। ১৯৭৮ সনে সুপ্রিম কোর্টের ৭ সদস্যক বেঞ্চের রায় সর্বসম্মত ছিল না। ৫ -২ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সুপ্রিম কোর্ট ১৯৭৮ সনের রায়ে শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শ্রম আইনের আওতার বাইরে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে রেখে শ্রমিক কর্মচারীদের শ্রম আইনের নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত রাখার পুঁজিবাদীদের অভিলাষে অনেকটাই বাধা পড়েছিল। ১৯৭৮ সনের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শিল্প বিরোধ আইনে 'শিল্পের' সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে উপকৃত হয়েছিল শ্রমিক কর্মচারীরা।

কর্পোরেট মহল রায়ের বিরুদ্ধে ছিল স্বাভাবিকভাবেই। শ্রম শোষণ ও শ্রমিক শোষণের ক্ষেত্রে ঐ রায় স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। শ্রমিক- কর্মচারীদের শক্তি যুগিয়ে ছিল অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও আইনি লড়াইয়ে। সুপ্রিম কোর্টের ১৯৭৮ সনের রায় অনুসরণ করে বিগত ৪৮ বছরে বহু শ্রমবিরোধের আইনী নিষ্পত্তি হয়েছে।

এই রায় পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন তুলছিল শিল্পমহল। বারবার বিভিন্নভাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যগুলিও চাইছিল ১৯৭৮ সনের রায়ের পরিবর্তন। কারণ ১৯৭৮ সনের রায়ে সামান্য সংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে "রাষ্ট্রের সার্বভৌম" তৎপরতার অধীনে রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্রের "সার্বভৌম তৎপরতার" অন্তর্গত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো 'শিল্প' বা 'ইন্ডাস্ট্রি' হিসেবে গণ্য হয় না। ২০০৫ সনে সুপ্রিম কোর্টের ৫ সদস্যক বেঞ্চ ১৯৭৮ সনের রায়ের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠায়। এখন প্রশ্ন হল, ৫ সদস্যক বেঞ্চের এখতিয়ার আছে কি ৭ সদস্যক বেঞ্চের রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলার

এবং ঐ রায়কে বৃহত্তর বেঞ্চে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানোর। ২০১৭ সনে সুপ্রিম কোর্টের ৭ সদস্যক বেঞ্চে ১৯৭৮ সনের ৭ সদস্যক বেঞ্চার রায়কে ৯ সদস্যক বেঞ্চে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠায়। যখন এই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য ৯ সদস্যক বেঞ্চে প্রেরণ করা হয় তখনই আশঙ্কা তৈরি হয়, পুনর্বিবেচনার ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার সংকোচিত হবে এবং শ্রম আইনের শ্রমিক কল্যাণকারী উদ্দেশ্য পরিপূরক আইনি ব্যাখ্যা দুর্বল হবে। বাস্তবে তাই হয়েছে।

এমনিতেই নতুন শ্রম বিধিতে শ্রমিক কর্মচারীদের আইনি সুরক্ষা, আইনি অধিকার ও মর্যাদা অনেকটাই দুর্বল হয়েছে ও হ্রাস পেয়েছে। তার উপর সুপ্রিম কোর্টের ২০শে আগস্ট এর সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকারহীনতাকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করবে। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত মিশ্র সহ অন্য চারজন বিচারপতির প্রদত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে ১৯৭৮ সনের রায়ের তিন পরীক্ষা বা ট্রিপল টেস্ট নাকচ হয়েছে। কোন সংস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান 'শিল্প' কিনা তা নির্ধারণের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় বলেছে, স্পষ্টতই বাণিজ্যিক চরিত্র প্রধান বিবেচ্য। এই ব্যাখ্যার ফাঁকে অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান 'শিল্প' হিসেবে গণ্য হবে না। রাষ্ট্রের সর্বভৌম তৎপরতার পরিধিও সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে শ্রম আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে। ৯ সদস্যক বেঞ্চার চারজন বিচারপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী রায়ে বলেছেন, ১৯৭৮ সনের রায় পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন নেই। ঐ রায় স্থায়ীত্ব অর্জন করেছে। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভূইয়া বলেছেন, প্রতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চয়তা রক্ষায় বজায় থাকে। বিচারপতি নাগারত্না বলেছেন 'শিল্পের' সংকীর্ণ সংজ্ঞা কোনভাবেই শিল্প-শান্তি ও শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক নয়।

বিচারপতি নাগরত্বার বিরুদ্ধ রায়ে সঠিকভাবেই শ্রমিক মালিকদের মধ্যকার বিদ্যমান অসম দরকষাকষির ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনের সুরক্ষার পরিসর সংকুচিত হওয়ার বিরুদ্ধে জোরালো আইনি ও সাংবিধানিক যুক্তি দেখানো হয়েছে। ১৯৭৮ সনে প্রদত্ত রায়ে সাত সদস্যক সাংবিধানিক বেঞ্চ শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রির বিস্তৃত সংজ্ঞা নির্ধারণ করে শুধুমাত্র শ্রমিকদেরই সুরক্ষা দেয় নি, রাষ্ট্রকেও তার কল্যাণমূলক দায়িত্ব থেকে সরে আসার সুযোগ দেয়নি। এই রায়কে পুনঃ বিবেচনার প্রশ্ন কেন তোলা হয়েছিল তা নয় সদস্যক বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

শিল্প বিরোধ আইন বা Industrial Disputes Act, 1947, ইতিমধ্যে রদ হয়েছে। শিল্প সম্পর্ক বিধি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স কোড, ২০২০ লাগু হয়েছে। শিল্প মালিকদের আশঙ্কা ছিল, শিল্প সম্পর্ক বিধির ২(পি) ধারা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সনে সুপ্রিমকোর্ট শিল্প বিরোধ আইনের ২(জ) ধারার ব্যাখ্যার জন্য যে নীতি নির্ধারণ করেছিল তা প্রযোজ্য হবে। তাহলে শিল্পের সংজ্ঞা থেকে মালিকদের পছন্দমত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেওয়া যাবে না। তাই ১৯৭৮ এর রায় পুনর্বিবেচনার তাগিদ মালিক পক্ষের কাছে ছিল। সুপ্রিম কোর্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে বলেছে, ১৯৭৮ সনের রায়ে প্রতিষ্ঠিত নীতিতে ২০২০ সনের শিল্প সম্পর্ক বিধির কোন ধারার ব্যাখ্যা চলবে না। বিচারপতির নাগরত্বা সঠিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের সাথে স্পষ্ট দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, নতুন আইন পুরনো আইনকে প্রতিস্থাপন করলেও যদি উভয়ের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য একই থাকে এবং যদি সংশ্লিষ্ট ধারার ভাষ্য দুটি আইনে অভিন্ন থাকে তাহলে পুরনো আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা নতুন আইনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যতামূলক নজির হতে পারে। ১৯৭৮ সনের রায়ের বিস্তৃত সুরক্ষা সরিয়ে নিলে লগ্নি পুঁজির হিংস্র আধিপত্যের সময়ে তীব্র বেকারী ও উৎপাদন ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণের ফলে শ্রমশক্তির দর কষাকষির ক্রম হ্রাসমান ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা গুরুতর ভাবে বিপন্ন হবে।

প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত ও অপর চার বিচারপতির সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে ১৯৭৮ সনের সুপ্রিম কোর্টের রায়কে প্রশ্ন করে বলা হয়েছে, ঐ রায় সামাজিক উদ্যোগ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজকে 'শিল্পের' পরিসরে নিয়ে এসেছিল। এই ব্যাখ্যা শ্রমিক সুরক্ষার প্রশ্নে ইতিবাচক হলেও তা নাকি শিল্প বিরোধ আইনের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল না। কি অদ্ভুত ব্যাখ্যা। শিল্পবিরোধ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অসম দরকষাকষির ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনা, শ্রমিকদের শ্রম সুরক্ষা প্রদান করা। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী পৃথক বিরুদ্ধ রায়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন।

"bear in mind that a workman seldom enters the field of negotiation as an equal ..."

সংবিধান এই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নির্দেশাত্মক নীতিসংক্রান্ত সংবিধানের ৪২ ধারার নির্দেশ, রাষ্ট্রের দায়িত্ব শ্রমের ন্যায্য ও মানবিক পরিবেশ নিশ্চিত করা। শ্রম আইন সংবিধানের ৪২ ধারার নির্দেশকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আইনি ব্যবস্থা। শ্রম আইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যকার চূড়ান্ত অসমতার প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের আইনী সুরক্ষা প্রদান করা। তাই শ্রম আইনের ব্যাখ্যাকে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাকারী বলা আসলে সংবিধানের নির্দেশের বাইরে গিয়ে শ্রম আইনকে দুটি সম ক্ষমতা সম্পন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ নিরসন ও শান্তিপূর্ণ ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইন হিসেবে দেখার মারাত্মক ভুল করা।

কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ১৩ সদস্যক বেঞ্চ ৭ -৬ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় স্পষ্ট ভাবে রায় দেয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্গত। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চূড়ান্ত অসমতা ১৯৪৭ সনের পর কমে নি বরং ইদানিংকালে এই পারস্পরিক সম্পর্ক জনিত অসমতা ভয়ঙ্করভাবে তীব্র হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে নয়া উদারবাদী

অর্থনীতির যুগে, কর্পোরেটদের সাথে ফ্যাসিবাদী শক্তির মিতালীর পর্বে শ্রমিকদের অবস্থা ভয়ংকরভাবে শোচনীয়। সমস্ত রকম শ্রম আইনগুলোর সংস্কার করা হচ্ছে। বহু যুগের লড়াইয়ে অর্জিত শ্রমিকদের অধিকার গুলিকে খর্ব করার জন্য। শ্রম শোষণের অবাধ পরিমণ্ডল তৈরীর জন্য। এই প্রেক্ষাপটে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে জরুরি হয়ে পড়েছিল, শিল্পের সংজ্ঞা যতটা সম্ভব সংকুচিত করে শ্রম আইনের সুরক্ষা থেকে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীকে বঞ্চিত করা। উল্লেখ্য ২০০৫ সনে উত্তর প্রদেশ সরকার বনাম জয়বীর সিং মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ৫ সদস্যক বেঞ্চ ১৯৭৮ সনের ৭ সদস্যক বেঞ্চের রায়ের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে ঐ রায়কে শ্রমিকদের প্রতি বেশী মনোযোগী ও শিল্প মালিকদের স্বার্থের প্রতি অমনোযোগী বলে বিদ্বাদ করেছিল। সংবিধানের নির্দেশ হচ্ছে, শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়ের স্বার্থে আইনকে হতে হবে শ্রমিক স্বার্থ অনুকূল। এবং আইনের ব্যাখ্যাকেও অতি অবশ্যই শ্রমিকদের স্বার্থের অনুসারী হতে হবে। শিল্প শান্তির স্বার্থে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে, শ্রমিকদের অধিকার, ন্যায্য পাওনা ও মর্যাদা সুরক্ষিত থাকা জরুরী। শ্রমিকদের বিরাট অংশকে আইনী সুরক্ষার রক্ষাকবচের বাইরে নিয়ে আসার কাজকে সুপ্রিম কোর্টের ৯ সদস্যক বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় সহজ করেছে। এর ফলে শ্রম অসন্তোষের আইনী-নিষ্পত্তি বা শান্তিপূর্ণ নিরসনের সুযোগ কমলো। পরিণতিতে শ্রমিক অসন্তোষ ও শ্রম অশান্তি বাড়বে।

উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হবে। আখেরে ক্ষতি কিন্তু হবে দেশেরই।

কেমন হবে ওদের হিন্দুরাষ্ট্র ?

--- মিহিরলাল রায়



হিন্দুরাষ্ট্রে অ-হিন্দুরা অধিকার হারাবে। "আমরা এবং আমাদের জাতিসত্ত্বার সংজ্ঞা"তে এম এস গোলওয়ালকারের ফরমান - "হিন্দুস্থানের অ-হিন্দু জনগণকে হয় হিন্দু সাংস্কৃতিক আয়ত্ত করতে হবে, হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি শিখতে হবে, হিন্দু জাতির মহিমাবর্ধন ছাড়া অন্য কোন চিন্তাকে ঠাই দিতে পারবে না তারা, অর্থাৎ এই দেশ ও এখানকার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি কেবল যে তাদের অসহিষ্ণুতা ও অকৃতজ্ঞতা বর্জন করতে হবে তাই নয়, তাদের (বর্তমান মনোভাবের) পরিবর্তে প্রেম ও ভক্তি অর্জন করতে হবে। তাদের বিজাতীয় হওয়া থেকে নিরস্ত হতে হবে কিছুই দাবি না করে, কোন সুবিধায় যোগ্যতাবোধ বর্জন করে। পক্ষপাত পূর্ণ ব্যবহার তো নয়ই এমনকি নাগরিক অধিকারও তারা পাবে না।" - এই ফরমানই স্পষ্ট বলে দেয় হিন্দুত্ববাদীদের হিন্দু রাষ্ট্রে যারা মুসলমান, যারা খ্রিস্টান, তাদের কি হবে।

কি হবে জৈন বৌদ্ধ শিখ ধর্মে বিশ্বাসী লোকজনদের? গোলওয়ালকার তার বই "বাক্স অফ থট"-এ অবশ্য জৈন বৌদ্ধ শিখ ধর্মকে হিন্দু ধর্মের সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায় গণ্য করেছেন। তা সত্ত্বেও ওই বইটিতে তিনি লিখেছেন, " বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের মায়েস সমাজ ও মায়েস ধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে। ১০ জুন ১৯৬৩ তে প্রকাশিত তাদের মুখপত্র "অর্গানাইজার" লিখেছে, "জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে বলা যায় তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় কোন

অবদান রাখতে পারেনি"। এ থেকে পরিষ্কার, ওদের হিন্দু রাষ্ট্র জৈন বৌদ্ধ শিখ ধর্মের প্রতিও সহানুভূতিশীল হবে না।

হিন্দুরাষ্ট্রে হিন্দুরা কি কিছু হারাবেন না? অমর্ত্য সেনের মতে, ওরা হিন্দু ঐতিহ্যের সহনশীল ও সুপ্রসারিত দিকটিকে পরিত্যাগ করে। সংকীর্ণ স্থূল দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করে। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে হিন্দুরাও হিন্দু ধর্মের যে সুপ্রসারিত দিক চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা, নানা ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সহনশীল যোগাযোগ ও আদান প্রদান এমনকি লোকায়াত জীবনে ভিন্ন ধর্মের যুক্ত সাধনা চর্চা করেন, তা থেকে বঞ্চিত হবেন। যা লক্ষ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিভঙ্গি, ভাব সম্ভাবনা ও জীবনযাপনকে ধ্বংস করবে। গোলওয়ালকার ভাষ্যে স্পষ্টতই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। যা প্রকৃত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে খাপ খায় না। যেমন ধরুন বিবেকানন্দেরই কথা। মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ হিন্দু প্রসঙ্গে কি বীক্ষা ছিল তাঁর? তিনি এদেশে হিন্দু ও মুসলিমদের মিলিত শক্তির উপর জোর দিতেন। বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পক্ষে ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, খ্রিস্টানদের হিন্দু বা বৌদ্ধ হবার প্রয়োজন নেই।

আবার একজন হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিস্টান হবার দরকার নেই। তাঁর অবিস্মরণীয় উক্তি ছিল - "খ্রিষ্ট ও বৌদ্ধরা অসীম সমুদ্রের ঢেউ ছাড়া আর কিছু নয়, যা আমি" - একজন বেদান্তবাদী হিন্দুর এই যে বীক্ষা, তার সাথে কি গোলওয়ালকারের বীক্ষা খাপ খায়? না।

প্রকৃত অর্থে হিন্দুত্ববাদীদের এই হিন্দু বিরোধী অবস্থান আরো বেপরোয়া, হিংস্র হবে ওদের হিন্দুরাষ্ট্রে। সাধারণ হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও তাদের স্বাধীন ধর্মাচরণে বাধা প্রাপ্ত হবেন। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে আমাদের অঞ্চলেও ওরা ওদের ধর্মাড়ম্বের জয় পতাকা ওড়াচ্ছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় সকল মন্দির মঠ আখড়া আশ্রম এমনকি স্থানীয় প্রচলিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উৎসবকে আরএসএস বলয়ে নেবার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শুধু কি তাই? আর্যাবৎ ও পশ্চিম ভারতের দেব দেবীর পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে আচার অনুষ্ঠান

প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের লোকায়ত হিন্দু উৎসবাদিকে খাটো করছে। কিংবা বিকৃত করছে। ওদের হিন্দু রাষ্ট্রে এসব কাণ্ডকারখানা বাড়বে।

সমাজ শাসনে আরএসএসের ধারণা - 'মনুর ভারত'-ই। গোলওয়ালকার মনুকে পৃথিবীর মহত্বম শ্রেষ্ঠ আইন প্রণেতা রূপে বর্ণনা করেছেন। আরএসএস মনে করে মনুস্মৃতিই আদর্শ। হিন্দুরাষ্ট্রে ভারতের সংবিধানে ওরা মনুস্মৃতি ঢোকাতে চায়। ২৬ শে নভেম্বর, ১৯৪৯ যখন সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া গৃহীত হয়, কী ছিল তাদের প্রতিক্রিয়া? ৩০ নভেম্বর ১৯৪৯, "অর্গানাইজার"-এ সংবিধানের সমালোচনা করে লেখা হয় যে, মনুস্মৃতিকেই অনুসরণ করা উচিত ছিল। যদি হিন্দুরাষ্ট্র হয় সমাজ শাসনে জাতপাতের অমানবিক অত্যাচার এবং নারীর ন্যূনতম অধিকার হরণও আমরা দেখতে পাবো। ব্রাহ্মণ্যবাদ জাঁকিয়ে বসবে। হিন্দু উচ্চবর্ণ দের সামাজিক অত্যাচার বাড়বে নিম্নবর্ণ শুদ্রদের উপর। যাদের মধ্যে আছেন ওবিসি, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতিরা। আর নারীদের অবস্থা? কেমন তাদের ভূমিকা নির্দিষ্ট আছে মনুসংহিতায়? পুরুষকে প্রভুর ভূমিকায়, নারীকে ক্রীতদাসের চেয়েও অধম, ধর্ষিতার চেয়েও অত্যাচারিতা, গৃহনালিত পশুর চেয়েও হীন ভূমিকায় নামিয়ে রেখেছেন মনু। মনুর বিধান অনুযায়ী নারীর স্বাধীনতা নৈব নৈব চ। শিক্ষা যে চেতনা আনে এবং সেখানে নারীদের বহি কর্ম যে অধিকার দেয় সে বিষয়ে মনুর কী বিধান? পতিসেবাই গুরুগৃহবাস, গৃহকর্মই হোম স্বরূপ অগ্রিপরিচর্যা। বিধানের এখানেই শেষ নয়। পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক কি হবে, তা নিয়েও রয়েছে অপমানকর মনুষ্যত্বহীন বিধান। এখনই মাঝেমধ্যে এমন আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছি, এমনকি রাষ্ট্র ক্ষমতা তে আসীন আরএসএস পরিচালিত কার্যকর্তাদের স্বরেও। হিন্দুরাষ্ট্রে কেমন হবে তার চেহারা, ভাবলে গা শিউরে ওঠ।

হিন্দুত্ববাদীদের কাছে যুক্তিবাদ কেবল না-পছন্দই নয়, তাকে ওরা ধ্বংস করতে চায়। রাষ্ট্রক্ষমতায় আরএসএস নিয়ন্ত্রণাধীন বিজেপির আসনে দেশজুড়ে এখনই যেন মুক্তচিন্তা, আধুনিক জ্ঞানচর্চা ব্রাত্য।

ধর্মের নামে, ধর্মীয় বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞানের চাষ হচ্ছে। ওরা পরিকল্পিতভাবে এই কাজটা করছে তিন ভাবে। প্রথমত, ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন ও সংযোজন করছে সে অনুকূলে। যেমন স্কুল স্তরে ডারউইন তত্ত্ব ও মেন্ডেলের পর্যায় সারণিতে কোপ। একেবারে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত "ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম" বা ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব চর্চার নামে পুরাণ কথা (মিথলজি)-কে বিজ্ঞানের আসনে বসাবার মরিয়া প্রচেষ্টা।

বিজ্ঞান ইতিহাসের বিকৃত উপস্থাপনা, ভ্রান্ত বিশ্বাস, অপবিজ্ঞানকে হাওয়া দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, এ দেশের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারগুলোকেও ওদের মতাদর্শে চালিত করে অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান চাষে ব্যবহার করা। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তির এবং কখনো কখনো পণ্ডিত মহলের নাট মন্দির থেকে জনমানুষেও অপবিজ্ঞান ভ্রান্ত বিশ্বাসকে হাওয়া দেওয়া। এর সাথে আবার রয়েছে চিন্তা নিয়ন্ত্রণে নাৎসি কৌশল। হিটলার যে সংস্কৃতি কর্মসূচি ও শিক্ষার ছাঁচ তৈরি করেছিল অনেকটা সেরকম। ওদের "বিদ্যা ভারতী" সেই ভাবাদর্শ সেই তৈরি। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতেও সেসব আছে। শিক্ষার্থীর মনকে উগ্র সাম্প্রদায়িক ভাবনায় জারিত করা। এতে কী হবে? মুক্ত মন, বিশ্লেষণাত্মক মন গড়ে উঠবে না। এ পথ আমাদের বিজ্ঞানের পথ থেকে বিচ্যুত করবে।

পিপলস ডেমোক্রেসি (১ জুলাই ২০২৪)-তে প্রভাত পট্টনায়ক মন্তব্য করেছেন "ভবিষ্যতের হিন্দু রাষ্ট্র অবধারিতভাবেই হবে একটি সন্ত্রাস নির্ভর একনায়কতন্ত্র"। তিনি আরো লিখেছেন, সন্ত্রাসের প্রয়োগ এবং হিন্দু আধিপত্যবাদের ইন্ধন এই দুটি বিষয় ছাড়াও হিন্দু রাষ্ট্রের সমর্থন তৈরি করবে করার তৃতীয় বিষয় হবে প্রতি বিপ্লবী ঘটনাক্রমের আছড়ে পড়া। কী সেই প্রতিবিপ্লবী ঘটনাক্রম? কী তার অভিঘাত? তিনি লিখেছেন, বিশ শতকের ভারত দুটি সমান্তরাল সংগ্রামের আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। একটি ঔপনিবেশিকতা

বিরোধী সংগ্রাম, অপরটি হাজার বছর ধরে চলে আসা বর্ণভিত্তিক সামন্তবাদী সমাজে সামাজিকভাবে নিপীড়িত জনগণের মুক্তির লড়াই। একটি সংগ্রামের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হয়ত অপরটির সমর্থক ছিলেন না কিন্তু জনগণের পরিসরে দুটি সংগ্রামের এক পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক ছিল। বামপন্থী আন্দোলনে এই পারস্পরিক নির্ভরতা প্রতিভাতও হয়েছে। এই যুগল আন্দোলনের ফলে দেশে এক বিপুল সামাজিক রূপান্তর ঘটেছিল। যদিও সেটা যতটা সর্বব্যাপী হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। বুর্জোয়া ভাবনার পরিধিতে আটকে থাকা সেই লড়াই বৃত্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তবে নিঃসন্দেহে এই রূপান্তর ছিল এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। তাঁর মতে, হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান, তার অন্তর্নিহিত অঙ্গীকার, প্রকৃত তৎপরতা এবং হিন্দুরাষ্ট্রের অভ্যুত্থান - এসব প্রশ্ন বাস্তবেই প্রতি বিপ্লবের পথ সুগম করবে। ধর্মনিরপেক্ষতার সংকোচন হবে, মানবাধিকার, যুক্তিবাদ প্রসার প্রতিহত হবে, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ননের প্রতিনিধিত্বকারী গণতন্ত্রের ক্ষয় হবে। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্র ক্ষমতাতে আরএসএস নিয়ন্ত্রণাধীন বিজেপির সমাসীন হবার পর জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ, এনআরসি - নাগরিক সংশোধনী আইন, প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি আইন - এসব কিছু সেই লক্ষ্যেই। প্রভাত পটনায়ক লিখছেন, হিন্দুত্বের প্রচার যন্ত্র এমন একটা ধারণা তৈরি করে যে, মনে হয় হিন্দু রাষ্ট্র আবির্ভূত হয়েই যেন হিন্দুদের মুক্তি নিয়ে আসবে। বিপরীতে হিন্দু রাষ্ট্র সংকট জর্জর উদারবাদের রক্ষায় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে পরিচালিত একটি একনায়কতন্ত্রের ছদ্ম আবরণ তৈরি করবে। সংখ্যা গুরুর স্বার্থ রক্ষাতো দুরাস্থান এর মধ্যে দিয়ে এমন একটি প্রতিবিপ্লব আছড়ে পড়বে, যা বিগত এক শতকে অর্জিত সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটাবে। সব মিলিয়ে বলা চলে, ওদের হিন্দু রাষ্ট্রে ভারত সভ্যতা বিরোধী সমাজ নির্মাণ করবে।

-:পলিফার্মাসি:-

- ডা: রূপালী চৌধুরী

সঠিক চিকিৎসা বা ঔষধ ব্যবহার না হওয়ার জন্য বিশ্বে মানুষের অতিরিক্ত খরচ হয় বিয়াল্লিশ (৪২) বিলিয়ন আমেরিকান ডলার (WHO Publication -7th March 2024)। এই বিশাল ক্ষতিকে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় তার জন্য "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা"-র পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসাবে, একটি 'থিম' গ্রহণ করা হয়-

"সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীদের নিরাপত্তা প্রদান" (Medication without harm)।

২০১৭ সালের ২৯ মার্চ জার্মান দেশের বন শহরে প্রথম এই বিষয়টি নিয়ে এক সম্মেলনে আলোচনা শুরু হয়। ধীরে ধীরে পলিফার্মাসি ও ডিপ্রেসক্রিপশন এবং "মেডিসিন উইদাউট হার্ম" নিয়ে সচেতনতা প্রচার বাড়ছে।

যখন কোন ব্যক্তি দৈনিক নিয়মিত পাঁচ বা তার বেশি ঔষধ খেয়ে থাকেন, তখন সেটাকে 'পলিফার্মাসি' বা বাহু-ঔষধ ব্যবহারের পর্যায়ে ধরা হয়। "ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেল্থ (NCBI-NLM-NIH) - আমেরিকার সরকারী প্রতিষ্ঠান বলেছেন, এর মধ্যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়াও দোকান থেকে নিজের কেনা ওষুধ (OTC) এবং ভিটামিন ও আয়ুর্বেদিক (Herbal), বাজারী জিনিসপত্র যেগুলোকে অনেকেই সাধারণভাবে ঔষধী- গুণাবলী ভেবে খেয়ে থাকেন সেগুলোও কিন্তু আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যখন চিকিৎসা ব্যবস্থা ততটা আধুনিক ছিল না, তখন অনেক অনুমান-ভিত্তিক ঔষধ-পত্র, যা ঐ সময়ে বাজারজাত ছিল, ভাল বা খারাপ, তাই দিয়েই চিকিৎসা করা হতো। বিংশ শতকে, বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধের -

পরে অনেক কার্যকরী মেডিসিন আবিষ্কার হয় এবং ফলস্বরূপ মানুষের গড় আয়ুও আধুনিক চিকিৎসায় বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘায়ুর (geriatric) জন্য মানুষের অসুখের সমস্যা ও সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ডাক্তারদের ও ব্যবস্থাপত্র ক্রমশঃ লম্বা হতে থাকলো। বর্তমানে, বহু বয়স্ক লোকের প্রেসক্রিপশনে ৬-১০ রকমের ঔষধ থাকে।

বিভিন্ন গবেষণায় (THE LANCET Vol.5, issue-6, June-2024) প্রকাশ পাচ্ছে যে, বৃদ্ধদের দুই-তিন রকমের অসুখের চিকিৎসার জন্য নানা রকমের ঔষধ নিতে হচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা না করেই কার্যকরী-অকার্যকরী অনেক কিছু থাকছে। ঐ গবেষণায় এসব মেডিসিন গুলোকে দুরকমভাবে তালিকাভুক্ত হসেছে। যেমন; appropriate এবং Inappropriate । তাহলে, দেখা যাচ্ছে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা আবার এক অন্য-রকম চিকিৎসা সংকটের সম্মুখীন হয়ে গেলাম।

এখানে আমি উদাহরণ দিয়ে বলার চেষ্টা করি। একজন ব্যক্তির যদি, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কম স্মৃতি-শক্তি ইত্যাদি সমস্যা থাকে তাহলে, অনেক সময় দেখা যায়, ব্যবহৃত বিভিন্ন ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার জন্য নতুন উপসর্গ তৈরী হয় (যেমন, অ্যাসিডিটি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য) তার জন্য আরো নতুন মেডিসিন নিতে হয়। বিভিন্ন গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে, বয়স্কদের পক্ষে এতসব মনে রেখে ঔষধ, সময়মত খাওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশের ছ'টা বিভিন্ন শহরে একটা স্টাডিতে দেখা গেছে বয়স্কদের 33.7% “পলিফার্মেসি” হচ্ছে। (Scientific reports 15, Article number: - 4062, [2025-www.nature.com](https://www.nature.com)) । অনেক সময়ই, সঠিক মাত্রায়, সঠিক ঔষধ (appropriate) ব্যবহারে রোগী ভালো থাকেন, সেটাও মনে নিতে হবে ।

২০২৬ সালে অনুমান করা হয়েছে, ভারতে সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি । সুতরাং, এই বিরাট জনসংখ্যার দিকে এখন নজর পরেছে

স্বাস্থ্য-বিমা, ওষুধ-কোম্পানি ও কর্পোরেট হাসপাতালের। তাই, আমাদের সতর্ক থাকতেই হবে, অন্তত চিকিৎসার খরচটা সেদিকেই ইঙ্গিত করছে এবং পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র এব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছে।

বিশ্বে এখন ও কোন দেশেই কোন সিভিল বা ক্রিমিনাল নীতি (Statutes) দিয়ে পলিফার্মাসি ব্যান করেনি অথবা এটাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করেনি। এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। খুব অল্পসময় বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনভাবেই এবিষয়ের সুরাহা সম্ভব নয়। “বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা” (WHO) কিছু গাইডলাইনস ধার্য করে দিয়েছে। যেমন, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বয়সের রোগীদের নিয়ে “গবেষণা প্রতিকা” প্রকাশের মাধ্যমে নিয়মিত ডাক্তার ও রোগীকে ‘বহু-ড্রাগ’ সেবন সম্পর্কিত তথ্য জনসমক্ষে আনতে হবে। তাছাড়াও, নিজের দেশের মধ্যে স্বেচ্ছায় কিছু “ফ্রেম ওয়ার্ক” তৈরী করে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হবে। মেডিক্যাল ও ফার্মাসিউটিকেল বোর্ডের মাধ্যমে পেশাগত দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য আরও সচেষ্টিত হতে হবে।

বর্তমান যে আইন আছে (Consumer Protection act-1986), সেই আইন মোতাবেক, যেখানে যেমন পেশাগত অবহেলা বা ম্যাল প্র্যাকটিশ হবে, তখন সেরকম ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে।।

পরিশেষে বলা যায়, রোগীদেরও অধিকার আছে তাদের নিজের অসুখ ও ওষুধ সম্পর্কে সবিস্তারে জেনে নেওয়ার। আমাদের চেষ্টা করা উচিত একই রোগের জন্য একাঠিক ডাক্তারের পরামর্শ না নেওয়া। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ওষুধের কার্যকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ডাক্তারকে জানানো। তাহলে, চিকিৎসকের পক্ষে ও ওষুধ কমানো (deprescription) অনেক সহজ হয়। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, ইন্টারনেট দেখে নিজে নিজে কোন কিছুকে ওষুধ হিসাবে গ্রহণ না করা। তাহলে, পলিফার্মাসি অনেক কমানো যাবে।

সামাজিক ও মানবিক অধিকার বিষয়ক কিছু কথা

- রঞ্জনা দত্ত

আমরা যদি একটু চোখ-কান খোলা রাখি তো দেখবো, শুধুমাত্র সমাজ জীবনে মানব অধিকার বা গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তা নয়। আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রতিপদে গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে নানাভাবে। শিক্ষা ব্যবস্থায়, স্বাস্থ্য পরিষেবায়, কর্মসংস্থান ব্যবস্থায়, সর্বত্র চলছে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি। স্কুলে-কলেজে উপযুক্ত মেধাবী ছাত্র ভর্তি হতে পারছে না। তার চেয়ে নিকৃষ্ট মেধাবী ছাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তির কোটায় অথবা প্রচুর টাকা ক্যাপিটেশন ফির নামে ঘুষ দিয়ে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে নিয়ে গেলে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে না। টাকার বিনিময়ে আবার সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে। অথচ স্বাস্থ্য-পরিষেবা পাওয়াটা কিন্তু মানুষের মৌলিক অধিকার।

চাকরির পরীক্ষাও প্রহসনে পরিণত হয়েছে। পুলিশ বিভাগ, সরকারি পরিবহন বিভাগ, কর্পোরেশন, দমকল বিভাগ, এমনকি দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ, যেমন মিলিটারি পুলিশ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ইত্যাদি বিভাগে চাকরি পেতে হলে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হচ্ছে। যার টাকা নেই, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তার চাকরি হচ্ছে না। অথচ উপযুক্ত হলে চাকরি পাওয়া তার গণতান্ত্রিক অধিকার।

এখন কথা হলো, এসব থেকে মুক্তির উপায় কী? কীভাবে মানুষ তার অধিকার ফিরে পেতে পারে ও ভোগ করতে পারে? ইতিহাস থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিই, তাহলে দেখব, জনজাগরণ ও বিপ্লবই হল এর একমাত্র পথ। যেমন হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, অথবা আমাদের দেশের স্বাধীনতা বিপ্লব।

কিন্তু বিপ্লব করব বললেই তো আর করা যায় না। একা একা বিপ্লব হয় না। বিপ্লব করার জন্য চাই সঠিক ও সম্যক চেতনা। কিসের বিরুদ্ধে বিপ্লব সেটা সঠিকভাবে জানা এবং অনেককে জানানো। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা এবং সম্মিলিতভাবে আন্দোলনে নামা। তা না হলে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো ক্রমশ খর্ব হতে থাকবে।

মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার হলো অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। এরপর আসে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি। তারপর কর্মসংস্থান ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য অধিকার। কলকাতা মুম্বাই কিংবা দিল্লির মত বড় শহরে কোনক্রমে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হলেও বাসস্থান অর্থাৎ আবাসন সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। শুধু শহর কেন গ্রামে-গঞ্জেও আবাসন সমস্যা রয়েছে। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ খাদ্য যোগাড় করতে পারলেও বাসস্থানের অভাবে খোলা আকাশের নিচে কিংবা ঝুপড়িতে বাস করছে। ফলে নানা রোগব্যাদি ও নানা ধরনের সমাজের পরিপন্থী কার্যকলাপ এই সমস্ত মানুষকে গ্রাস করছে।

এবার আসা যাক, মানুষের আর এক জীবনের অধিকার এর কথায়। সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন, দূষণমুক্ত পরিবেশ পাওয়াটা মানুষের জীবনের অধিকারের মধ্যে পড়ে। সে কারণে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশকিছু আইন বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা সরকারের দায়বদ্ধতা থেকেই। কিন্তু সে আইনকে বলবৎ করা ও যথাযথভাবে মেনে চলতে বাধ্য করাটাও সরকার তথা প্রশাসনের কাজ। কিন্তু এখানেই হচ্ছে আসল গলদ। আইন বা নিয়মবিধি তৈরি হলো, কিন্তু তা মানছে ক'জন! আর মানতে বাধ্য করছেই বা কে!

দূষণ তো এক রকম নয়, একাধিক। পরিবেশগত দিক থেকে দেখলে বায়ু দূষণ, জল দূষণ, মাটি দূষণ, যেমন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পক্ষে হানিকর; তেমনি সমাজগত দিক থেকে দেখলে দৃশ্য-দূষণ, শব্দ-দূষণ, বাক্য-দূষণ এসব সমাজ জীবনের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার অন্তরায় হয়। কিন্তু এসব দূষণ রোধ করার জন্য সরকার বা প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় না। ফলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

এবার আলোচনা করা যাক মানবিক অধিকার নিয়ে। কথাটা শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই! মানবিক অধিকার প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হচ্ছে ও হ্রাস পাচ্ছে কীভাবে, তা দেখা যাক।

'সমাজবিরোধী' শব্দটা গত কয়েক দশক ধরে প্রচলিত হয়েছে। সমস্ত গণমাধ্যমে এবং রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণে এসব ঘুরেফিরে আসে। 'সমাজবিরোধী' বলেই বোধহয় এই বিশেষ শ্রেণীটা সমাজে বসবাস করে না। এদের আবাসস্থল হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। আবার পোর্টফোলিও-হীন কোন রাজনৈতিক নেতার নাম কাগজে কিংবা পোস্টারে ছাপা হলে, তার নামের পাশে 'সমাজসেবী' এ শব্দটা বসানো হয়।

অর্থাৎ কিনা সমাজসেবীরাও রাজনৈতিক দলেই অবস্থান করেন। আমি সমাজের একজন সাধারণ সামাজিক জীব হয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখি, 'সমাজসেবী' ও 'সমাজবিরোধী'র কী অদ্ভুত সহাবস্থান! বিস্ময়ের ঘোর কাটলে গভীরভাবে যখন ভাবি, তখন বুঝি যে, আমার বোঝা উচিত ছিল সিংহ আর হরিণ এক ঘরে অর্থাৎ এক দলে থাকা সম্ভব নয়। থাকেও না। আসলে ওরা সিংহও নয় আবার হরিণও নয়। অর্থাৎ সমাজসেবীও নয় আবার সমাজবিরোধী ও নয়। প্রায়শই দেখা যায়, কোন রাজনৈতিক দলের কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা তার গোষ্ঠীকে সমাজবিরোধী আখ্যা দেওয়া হল এবং শুদ্ধাচার প্রদর্শনকারী সেই দল তৎক্ষণাৎ তাকে বা তার গোষ্ঠীকে বহিষ্কার করে দিল। কিংবা দলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই ঘোষণা করে সাধারণ মানুষের বাহবা লাভ করেন। সাধারণ মানুষও পরম তৃপ্তিলাভ করে এই ভেবে যে, যাক রাজ্য বা দেশ চালানো রাজনৈতিক দলের কিছুটা শুদ্ধিকরণ তো হল।

কিন্তু এই তৃপ্তিটুকু মরুভূমিতে বৃষ্টি পড়ার মতো ক্ষণস্থায়ী। কিছুদিন পরেই দেখা যায়, বহিষ্কৃত 'সমাজবিরোধী' বিপক্ষীয় দলে 'সমাজসেবী' হয়ে বড় নেতার পাশে মঞ্চ আলো করে বসে রয়েছেন।

বাঙালি 'আত্মবিস্মৃত জাতি' হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চয় মনে পড়বে, কিছুদিন আগেই রাজ্যের মন্ত্রীর পাশে মঞ্চ আলো, নাকি অন্ধকার করে বসে থাকা খুনের

আসামির ছবি, যার নামে নাকি ওয়ারেন্ট আছে এবং পুলিশ তাকে খুঁজছেন। কিন্তু মন্ত্রীর অন্ধকারে তিনি লুকিয়ে থাকায়, প্রকাশ্য দিবালোকে লক্ষ মানুষের সামনে উন্মুক্ত মঞ্চে বসে থাকা আসামিটিকে পুলিশ খুঁজে পাচ্ছেন না।

যদিও এ দৃশ্য আমজনতার কাছে মোটেও নতুন নয়। সমাজের চোখে ও আইনের চোখে 'সমাজবিরোধী' বলে চিহ্নিত ধিকৃত ও বহিষ্কৃত মানুষটি দ্বিপক্ষীয় দলে সমাজসেবী রূপে আবির্ভূত হন ও আদরণীয় হয়ে ওঠেন। তখনই প্রশ্ন ওঠে সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে।

কেননা, যে ব্যক্তিটি কিছুদিন আগেই গোটা চারেক মানুষকে খুন করেছে, তোলাবাজি করেছে, নারী-ধর্ষণ করেছে, সেই মানুষটিকে দল-বদলানোর কারণে রাতারাতি সমাজসেবীর মান্যতা দিতে হবে কেন? শুধুমাত্র গোটা কতক নেতা মন্ত্রী নিয়ে তো দল নয়! দল হল সাধারণ জনগণের। তাহলে শুধু কয়েকজন নেতার অনুমোদনে একজন সমাজবিরোধী দলে জায়গা পেয়ে যাবে এবং কিছুদিন পরেই সে দলে ছাতার আশ্রয় থেকে আবার সিংহ মূর্তি ধারণ করবে এ কেমনতর কথা! জনগণের কি অধিকার নেই এই মানুষটিকে দলে থাকতে দেওয়া বা না দেওয়ার?

দল তো জনগণেরও। হয়তো বলা হবে— নিশ্চয়ই অধিকার আছে। জনগণের ভোটের অধিকার আছে। কিন্তু 'সিংহরিণ'টা ততদিন সিংহরূপ ধারণ করে হুংকার ছাড়তে শুরু করেছে। তাতে ভোটের বুথ অন্ধ জনগণের যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিংবা স্বাধীন মত প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এটাকেই বলা হচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন। এখানেই গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে— আইনের ও প্রশাসনের চোখে যে মানুষটি অপরাধী, সে মানুষটিকে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো, শাস্তির দাবি জানানোর অধিকার মানুষের আছেই। প্রতিটি সমাজ সচেতন মানুষের সোচ্চার হওয়া উচিত সেই ব্যক্তি এবং আশ্রয়দাতা দলটির বিরুদ্ধে। তা সে নিজের প্রিয় দল হলেও। বরং নিজের পছন্দের দল হলে তাকে পরিচ্ছন্ন ও সমাজবিরোধী-মুক্ত রাখার দায়িত্ব

আরও বেশি থাকবে। পছন্দের জিনিসকে মানুষ সহজাত প্রবৃত্তিতেই বেশি করে যত্ন নেয়, সুরক্ষা দেয়, আগলে রাখে।

সমাজের স্বার্থে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ক্লেদাক্ত দলকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে নতুন দলকে সিংহাসনে বসালেই জনগণের দায়িত্ব শেষ হয় না। নতুন দলে জায়গা পেতে চাওয়া তথাকথিত ক্লেদকে প্রতিহত করাটাও জনগণের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে প্রশাসনিক সাহায্য পাওয়া মানুষের অধিকার। কিন্তু মানবিক অধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় এবং ভয় ও ঝঙ্কাটমুক্ত থাকতে চাওয়ার কারণে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে গভীর ভাবে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলে, সমাজবিরোধী ও সমাজসেবী শব্দদুটি আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মনে হয়। কিন্তু এটা কখনো কাম্য নয়। যদি অহিফেন সেবি কথাটার অর্থ আফিং খান যিনি, এরকম বৃহত্তর অর্থে সমাজসেবী মানে সমাজকে খান যিনি, ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সমাজসেবী ও সমাজবিরোধী অনেকটা সমার্থক দাঁড়ায়।

বর্তমানে জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা জনপ্রতিনিধি কীভাবে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, কোটি কোটি টাকা রোজগার করছেন, তার দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি। কোন কোন জনপ্রতিনিধিকে এও বলতে শোনা যাচ্ছে, 'পাঁচ বছরের জন্য এসেছি। কয়েক কোটি টাকা কামিয়ে নিই। পরের বারে তো আর জনগণ আমাকে ভোট দেবে না।'

আমার বক্তব্য পরের বারের ভোট অবধি অপেক্ষা কেন? জনগণের এই অধিকার পাওয়া উচিত, দুর্নীতিগ্রস্ত জনপ্রতিনিধির দুর্নীতি প্রকাশ হলে, তৎক্ষণাৎ তাকে ক্ষমতাসীন আসন থেকে টেনে নামিয়ে আনা।

স্মার্ট সিটির স্মার্ট ধাক্কায় নাগরিক অধিকার ভুলুষ্ঠিত: দায় কার ?

- মণিময় রায়



রাস্তায় চলাচলকারী যেকোনো মানুষের নিরাপদে চলাই থাকে আসল উদ্দেশ্য। এখন রাস্তায় চলাটা মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে কিনা সেটাই প্রশ্ন। স্মার্ট হবার প্রশ্নে খোঁড়া খুঁড়ি চলছেই। রাস্তার কাজের শেষ পর্বে মনে হচ্ছে জল নিকাশের পাইপ বসাতে হবে। কারন রাস্তা থেকে অনেক উঁচু হয়ে গেছে ঢাকনা দেওয়া ড্রেন। নিজের নিরাপত্তার জন্য এবং সুস্থ থাকার জন্য মানুষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটবেন না। রাস্তার পাশ দিয়েই হাঁটবেন। এখন রাস্তার পাশে যদি নতুন করে পাইপ বসানোর জন্য গর্ত কাটা হয় তাহলে মানুষ হাঁটবেন কোথা দিয়ে? যে কেউ বলবেন 'কেন ফুটপাথ দিয়ে' ! এখন ফুটপাথ গুলো নানা সময়ে দ্বিচক্র যানে দখল হয়ে থাকে। তাহলে পথচারী কোন দিক দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছুবেন ? উত্তর আছে ? নেই। বটতলা থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনী হয়ে কামান চৌমুহনী যাওয়ার রাস্তা দীর্ঘদিন কাটা। বিপজ্জনক অবস্থা। যে কোনো মোটর যানে যান অবস্থা কাহিল। এবার বটতলা থেকে দুর্গা চৌমুহনীর দিকে যান । সব ফুটপাথ দখল। শঙ্কর চৌমুহনীতে কাটাকুটি চলছে , হেঁটে যাওয়া মানে হাতে প্রাণ নিয়ে যাওয়া। নিজের যান নিয়ে যাবেন? কিন্তু রাখবেন কোথায়? এবার চলে আসুন রাস্তা তৈরির জায়গায়।

পিচের ওপর পাথর, রাস্তায় পড়ে গেল। তিনটনের রোলার চাপলো। ঝকঝকে রাস্তা তৈরি হলো। বৃষ্টি হলো। রাস্তা জলে ভরে গেল। আধুনিক পদ্ধতিতে নর্দমার নামকরণ হয়েছে কভার্ড ড্রেন। এই ড্রেন দিয়ে আধুনিক ব্যবস্থায় ড্রেনের জল রাস্তায় চলে আসছে। নতুন তৈরি রাস্তার ছাল চামড়া উঠে প্রাকৃতিক গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টিতে ঐ গর্ত জলে ভর্তি হয়ে গর্ত চলে যায় 'অলক্ষ্য'। ব্যাস ওখানে পড়ে গিয়ে পথচলতি মানুষ হয় হাবুডুবু খাচ্ছেন, নতুন যান নিয়ে পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করছেন। হাসপাতালে গিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। কেন এমন হবে? জীবনের অধিকার কেন থাকবেনা?

তথ্য খুঁজে বের করতে গিয়ে দেখি চোখ চড়কগাছ। অভিযোগ যে সমস্ত ঠিকাদার কাজ করছেন তাদের সমস্যা শুরু হয় যখন 'টেন্ডার হতে পারে' সেখান থেকেই। অভিযোগ প্রথমে টেন্ডার হবার সম্ভাবনা তৈরি হতেই যেখানকার কাজ সেখানে একটি মঞ্চ তৈরি হয়ে যায়। তার নাম 'নিগো মঞ্চ'! অর্থাৎ যারা টেন্ডার দেবেন তাদের অধিকার ঠিক করে দেবেন ঐ মঞ্চ, এমনই অভিযোগ, বিনিময়ে কাজের মোট মূল্যের দশ থেকে পনের শতাংশ মঞ্চের কাছে জমা পড়বে। পদ্ধতিটা এমন, টেন্ডার জমা পড়বে চারটি। তিনটি জমা হবে বেশী 'রেটে' একটা কম রেটে। অর্থাৎ যিনি কাজটি পাবেন তার নাম ঠিক হয়ে যাবে ঐ মঞ্চ এবং ঐ ঠিকাদার কাজ আরম্ভ হবার আগেই ১০/১৫ শতাংশ খরচ করে ফেলেন। এরপর রাজনৈতিক চাপ ও ফান্ড প্রদান সেটা আলাদা। এবার কাজের জায়গায়। সেখানকার ক্লাব আছে, সাথে দাদারা। অভিযোগ সেখানে আবার নতুন কায়দা। ক্লাবের কিছু কাজ করে দেবেন, সাথে মন্দিরের ব্যবস্থা থাকতে পারে (গম্ভীর গলায়, লাল চোখে)। তবে একাজগুলো কিন্তু ক্লাব করে নেবে। খরচা ঠিকাদারের। এরপর ঠিকাদার কাজ করবেন লভ্যাংশের দিকে না তাকিয়ে সেটা ভাবা যায়?

তাই দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত দায় গিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের অধিকারের গায়ে। প্রথম রাস্তার ওপরের চামড়া, এরপর বিটোমিন মিশ্রিত পাথর ছুটতে শুরু

করে।জানা গেছে,সম্প্রতি দক্ষিণ ত্রিপুরার একটি স্কুলে একটি বিন্ডিং নির্মাণ হবে। দাবি সেখানে আড়াই কোটি টাকা খরচ হবে। হাত বদল হওয়া ঠিকাদার নাকি ৪০ লাখ টাকা খরচ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই, ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার আগেই। এরপর আরও আছে। কি কাজ হবে? ঐ ঠিকাদারই বা কি আয় করবেন ? এভাবেই চলার ফলে বিজ্ঞান সম্মতভাবে রাস্তার জল ড্রেনে না গিয়ে রাস্তায় আসছে, রাস্তার বিটোমিন সড়ে গিয়ে গর্ত হচ্ছে, সেখানে দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পথচারী হাসপাতালে।এই ঘটনা নিয়মিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিতভাবে প্রজ্ঞা ভবনে সভাও করছেন। এরপর কি হচ্ছে সব, উনিই বলতে পারবেন। সাধারণের অধিকার রক্ষার দায় কার? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় নি। ফুটপাথে দখল, রাস্তা অকেজো, ট্রাফিক ব্যবস্থা লাটে উঠে গেছে । তাহলে আমরা কি চলাচলের অধিকার হারালাম? এই প্রশ্ন মুখে মুখে।আনন্দের কথা একটি নতুন সহায়ক হাসপাতাল হয়েছে মটর স্ট্যাভে।



মানবাধিকার লুণ্ঠন করে চলছে বক্তৃতা!

- নিজস্ব প্রতিবেদন



আমাদের রাজ্যের মানুষ চিকিৎসার সমস্ত সুবিধাই হাতের নাগালে পাচ্ছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বক্তৃতা করে চলেছেন। উপরের দুটো ছবি অন্য কথা বলে। একটি শ্রীকান্তবাড়ী এডিসি ভিলেজের দেব কুমার পাড়ার ছবি। সেখানে বাড়িতে সন্তান প্রসবের পর মাকে কাপড় ও অস্থায়ী খাটিয়ায় করে সাত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেহাল যোগাযোগ অবস্থার কারণে সন্তান জন্মের আগে মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় নি। সুচিকিৎসার সুযোগ ও যোগাযোগ সুযোগ পাওয়া কি মানবাধিকারের পড়ে না? মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন?

দ্বিতীয় ছবিটি ভুরাতলির এডিসি ভিলেজের মোহিনী নগরের। সেখানকার কড়ইল্লাবাড়ি এলাকার কৃষ্ণদাস ত্রিপুরা মারাত্মক অসুস্থ। তাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে বাঁশ বেত দিয়ে তৈরি শিশুর দোলনা যার স্থানীয় নাম 'ওয়ায়েঙ', সেটাতে ঝুলিয়ে। এই পাড়া থেকে এই এলাকার বাজার পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার পথ, একসময়ে ভালো রাস্তা ছিল। ভেঙে চুরমার এই রাস্তা, এখন হাঁটাচলার অনুপযুক্ত। স্বপ্নে গাড়ি চলাচল করে।

এই ভাবে প্রতিদিন মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে সরকার বক্তৃতা করে চলেছে "দুয়ারে স্বাস্থ্য, দুয়ারে গাড়ি"- অথচ বাস্তবতা হলো "মানবাধিকার ভুলুষ্ঠিত"!

অর্থের অভাব দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের 'মিড ডে মিল' পাবার অধিকার রাখার চেষ্টা হচ্ছে: বেতনহীন কুক কাম হেল্পাররা

...নিজস্ব প্রতিবেদন

সরকার পরিচালিত ও অনুদানভুক্ত স্কুল গুলোতে মিড মিল প্রায় বন্ধ হবার মুখে। মূলতঃ শিক্ষা অধিকর্তা দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় গ্র্যান্টের টাকা না আসায় স্কুলগুলো সমস্যায় পড়েছে। সাধারণত মিড ডে মিল পরিচালনা করে স্বসহায়ক দল বা স্কুলেরই তৈরি করা কোনো গোষ্ঠী । এই গ্রুপ গুলো অধিকাংশ বেকার ছেলে মেয়েরা চালায়। ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের একটি টাকাও না আসাতে এই গ্রুপগুলো সমস্যায় পড়েছে। বাজার থেকে ধার দেনা করে গত পাঁচ মাস এই প্রকল্প চালানোর পর তাদের পক্ষে এই প্রকল্প টেনে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এদের হয়তো মিড ডে মিল বন্ধই করে দিতে হবে। এদিকে এই মিড মিলের রান্নার সাথে যুক্ত কুক কাম হেল্পাররাও দীর্ঘদিন বেতন পাচ্ছেন না। যা সরাসরি মানবাধিকার লঙ্ঘন। দপ্তর সূত্রে খবর "আর্থিক সংকট"! অন্যদিকে ডিম, সহ অন্যান্য মশলার দাম জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মিড ডে মিলের বরাদ্দকৃত টাকা বাড়েনি। রান্নার কাজে যুক্তদের মজুরী না দেওয়া মানবিক অধিকার বিরোধী। দপ্তর সূত্রের খবর প্রায় চল্লিশ শতাংশ ছাত্রছাত্রী শুধু স্কুলে যায় মিড ডে মিলের জন্য। সম্প্রতি ত্রিপুরার ভারত বিখ্যাত জুডোকা নিজেও স্বীকার করেছেন সেকথা। এখন এই প্রকল্প টাকার জন্য বন্ধ হলে তা হবে সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের অধিকার ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের বিরোধী। কারন ২০০১ সালের ২৮ শে নভেম্বর পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ান মামলায় বিচারপতি বি এন কৃপাল ও বিচারপতি জি বি পট্টনায়কের বেঞ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে রান্না করা পুষ্টি খাবার চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখন এটা যদি অর্থাভাবে বন্ধ হয় তাহলে তা হবে ছাত্রছাত্রীদের অধিকারের বিরুদ্ধে । একই সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘন ।

রাজ্যের পাম্প অপারেটররা সুখে নেই

- রতন দেবনাথ

আমাদের রাজ্যে কৃষি ক্ষেত্রে এবং পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য হাজার, হাজার পাম্প অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে বিগত কয়েক দশকে। সেই সকল পাম্প অপারেটররা সুখে নেই। বর্তমানে যে সকল পাম্প অপারেটরগণ রয়েছে তাদের সিংহ ভাগ ১৯৯৫ সনের পর থেকেই কোনো না কোনো ভাবে নিযুক্ত হয়েছে সরকারি পদ্ধতির মাধ্যমে। রাজ্যে দুই ধরনের পাম্প অপারেটর রয়েছে, এক কৃষকের ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করার জন্য পাম্প অপারেটর যাদের L.I বা W.R পাম্প অপারেটর বলা হয় আর পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য D.W.S পাম্প অপারেটর। রাজ্যে এই দুই ক্যাটাগরি মিলে প্রায় ৮ হাজার। পানীয় জল বিভাগে প্রায় ৬ হাজার আর কৃষি ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করার জন্য প্রায় ২ হাজার পাম্প অপারেটর কর্মরত।

নামে পাম্প অপারেটর বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা পার্ট টাইম ওয়ার্কার। তাদের অধিকাংশ নিয়োগ পত্রে পার্ট টাইম উল্লেখ থাকলেও তাদেরকে সেই সুযোগ, সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। ২০১২ সনে অর্থ দপ্তর থেকে এক নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, যে সকল পার্ট টাইম ওয়ার্কারদের ১০ বৎসর পূর্ণ হয়েছে তাদের ডিআরডব্লিও করার জন্য, যার নম্বর F. 34(6)FIN(G)/2012 তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর ২০১২ ইং। কিন্তু, নির্দেশই সার, কোনো প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। যদি কার্যকর করা হতো অধিকাংশই আজ ডিআরডব্লিও হয়ে যেত এবং রেগুলারের দাবিদার থাকতো। আর রেগুলার যদি না হতো তবে তো বেতন ডাবল পেত এবং কোনো ভাবে দিন গুজরান করতে পারতো। কিন্তু, সেই সুবিধা থেকে পাম্প অপারেটররা বঞ্চিত। ১৯৯৮ সনে পাম্প অপারেটরদের মাসিক বেতন ছিল ১ হাজার টাকা তা কচ্ছপ গতিতে বৃদ্ধি হতে হতে বর্তমানে ৭ হাজার টাকা। নেই কোনো ছুটি, নেই কোনো ওভার টাইম বেতন। কি যে ক্রীতদাসী

আইন বলবৎ। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, তাদের নিয়োগ প্রত্রে ৪ ঘন্টা কাজের কথা বলা থাকলেও প্রকৃত পক্ষে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ভয়, ভীতি দেখিয়ে কাজ করানো হয় ৮ থেকে ১০ ঘন্টা। দুই শিফটে ঐ সময় কাজ না করলে গ্রামে, গঞ্জের অতি বিপ্লবী সিকি, আদলি নেতাদের অভিযোগে তাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। তাই জীবন, জীবিকা প্রতিপালনের কথা চিন্তা করে নিরবে পাম্প অপারেটররা দৈনিক ৮ থেকে ১০ ঘন্টা কাজ করতে হয়।

পরিবারের অভাব, অনটনের কথা চিন্তা করে অসহায় মানুষেরা স্বল্প বেতনে সরকারি কোনো ক্ষিম কাজে যোগদান করে ভবিষ্যতে একটা সময়ে কোনো কিছু একটা হবে বলে। কিন্তু, অপেক্ষা করতে, করতে যখন বাড়ি যাবার সময় এসে যায় তখন চোখের পানি আর বাকরুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না। একটা রাজ্যের প্রশাসন যখন সুষ্ঠু ও নিয়মমাফিক ভাবে চলে না, তখন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়। বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পরা মানুষদের। আর প্রশাসনকে ঐ ভাবে চলতে উৎসাহিত করে জনপ্রতিনিধি মন্ত্রী ও বিধায়করা। রাজ্যে বিগত সময়ে যে সরকার ছিল, সেই সময়ে অনিয়মিত কর্মচারী এবং আংশিক সময়ের কর্মচারীদের জন্য নিয়ম, নীতি চালু ছিল। সময়ে, সময়ে যেমন বেতন বৃদ্ধি হতো, তেমনি নির্দিষ্ট সময় পর অর্থাৎ ১০ বা ১৫ বৎসর পর নিয়মিত করা হতো। কিন্তু, এইসব নিয়ম, নীতি আজ অচল অর্থাৎ ২০১৮ সনে বর্তমান বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিন মাসের মধ্যেই বাতিল করে দিয়েছে। সেই বাতিল করা আইনে শুধু পাম্প অপারেটরই বঞ্চিত হয়নি। একই সাথে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের হাজার হাজার অনিয়মিত কর্মচারীরা পথে বসে গেছে। আজ রাজ্যের অনিয়মিত কর্মীরা দীর্ঘ ৩০-৩৫ বৎসর কাজ করে খালি হাতে, চোখের পানি ফেলে বাড়িতে চলে যাচ্ছে। অথচ, ক্ষমতায় আসার আগে এই বিজেপি সরকারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সকল অনিয়মিত কর্মচারীদের ৬ মাসের মধ্যে নিয়মিত করে নিবে। আজ রাজ্যের প্রায় ৪০ হাজার অনিয়মিত কর্মচারীর ভবিষ্যত অন্ধকার ও অনিশ্চিত।

অথচ, রাজ্যের সকল প্রান্তে L.I এবং D.W.S পাম্প অপারেটররা নাগরিকদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাদের ছাড়া দৈনন্দিন জীবন কি সচল ? ঘুম থেকে উঠেই গ্রাম, গঞ্জ, শহর, নগরে নাগরিকদের পানীয় জলের চাহিদা D.W.S পাম্প অপারেটররা যেমন পূরণ করেন, তেমন গ্রামের কৃষি ক্ষেত্রে সকাল, বিকাল জল সরবরাহ করে কৃষি সম্পদকে বাঁচিয়ে রেখেছে L- 1 বা WR পাম্প অপারেটররা । এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ গুলো পাট টাইম পাম্প অপারেটরদের দিয়ে করানো হচ্ছে অথচ তারা সুষ্ঠু ভাবে কি করে বেঁচে থাকবে রাজ্যের দায়িত্বশীল অধিকারি, মন্ত্রীরা তার খবর রাখেন না। এমন কি, তাদের চাকরি কিভাবে দুর্বল করা যায় বর্তমান সরকার সময়ে সময়ে নতুন, নতুন ফন্দি প্রয়োগ করছে। যেখানে সরকারি কোনো আধিকারিক পাম্প অপারেটরদের পরিচালনা করার কথা, বর্তমানে সেই কাজটি গ্রামের প্রধান বা মেম্বারের নিকট অর্পণ করা হয়েছে। যাহাতে পাম্প অপারেটরদের খুবই চাপে রাখা যায় এবং ভূয়া অভিযোগ দেখিয়ে ছাঁটাই করা যায়। সম্প্রতি কয়েক বৎসরে এমন ঘটনা অনেক কর্মীর সাথে ঘটেছে। ফলে পাম্প অপারেটররা আজ নিরাপত্তা হীন। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, তাই কোন কিছুর অপেক্ষা না করে রাজ্যের পাম্প অপারেটররা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারীর মঞ্চের সাথে সামিল হচ্ছে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে সেই অধিকার পূরণ করবে । ইতিহাস সেই আত্মবিশ্বাস দিয়েছে খেটে খাওয়া মানুষদের। পাম্প অপারেটররা সেই সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে।

ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন, দুর্গা চৌমুহনী বিপনিবিতান, কর্তৃক থেকে প্রকাশিত

সম্পাদক পুরুষোত্তম রায় বর্মণ